ইংরেজী সাহিত্যের

গল্প কথা

এম. এলহাম হোসেন

ইংরেজী সাহিত্যের গল্পকথা

এম. এলহাম হোসেন

বিদ্যানুরাগ
৩৮, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

☞ প্রকাশনায়
এম. এ. আজিজ
বিদ্যানুরাগ
৩৮, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০।

☞ গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

☞ প্রথম প্রকাশ,
ডিসেম্বর-২০০০ ইং

☞ কম্পোজ
মোঃ রাইসুল ইসলাম, নিউটন
বি. এ. অনার্স (ইংরেজী)
এম. এ. (ইংরেজী)

☞ প্রচ্ছদ,
রতন, সুলেখা

☞ মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)।

☞ মুদ্রণে ঃ
টাইম প্রিন্টিং, প্রেস
চকযাদু ক্রসলেন, বগুড়া।

☞ পরিবেশনায়,
সাহিত্য সোপান
বড় মসজিদ লেন,
বগুড়া

উৎসর্গ

প্রাণপ্রিয় শিক্ষাগুরু,
বগুড়া জিলা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

মরহুম আব্দুল কুদ্দুস সরকারকে।

প্রাক্ কথন

ইংরেজী পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ভাষা। এই ভাষার বর্তমান শব্দ সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ। এছাড়া প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাষার শব্দ যোজন- বিয়োজন ও অবিকৃত ভাবে এ ভাষার শব্দ ভান্ডারে যোগ হয়ে সমৃদ্ধ করেছে ইংরেজী ভাষার শব্দ কোষ। আর ইংরেজী সাহিত্য তো একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ভান্ডার যা'তে আছে মানব জীবনের দৈনন্দিন জীবনের হাঁসি, কান্না, সুখ-দুঃখ, মানব মনের জটিল স্তর সমূহের বিশ্বাসযোগ্য পর্যালোচনা, জীবন দর্শন ও মুক্ত চিন্তার অফুরন্ত খোঁড়াক। ইংরেজী সাহিত্য তথা ইংরেজী ভাষার জনক চসার হতে আজ পর্যন্ত অনেক জ্ঞানী -গুণী, লেখক-সাহিত্যিক ইংরেজী সাহিত্যের উর্বর ভূমিকে করেছে উর্বরতর। বাংলা সাহিত্যের যেমন স্বভাবী-অস্বভাবী বহু পথ দেখিয়েছেন দশজন দ্রষ্টা কবি যেমন- মধু সূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্র-নাথ সেন গুপ্ত, মোহিত লাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমীয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাস, তেমনি চসার, শেকস্‌পীয়ার, স্পেন্সার, মিল্টন, টি. এস. এলিয়ট প্রমূখ ইংরেজী সাহিত্যকে বিশ্বজনীন আবেদনের ও আরাধ্য বস্তুতে পরিণত করেছেন। এঁদের অবদানে ধন্য ইংরেজী সাহিত্য যেমন ব্যাপকতর পরিধি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তেমনি জটিলতর শিল্পরস ও জীবন বোধেসরস হয়ে উঠেছে। বর্তমানে সাহিত্য এতটাই ভাবগর্ভ হয়ে উঠেছে যে একে আঁট- সাঁট সংজ্ঞার আওতায় ফেলার ধৃষ্টতা দেখানো চরমতম বোকামীর পরিচায়ক।

সাহিত্যিকের দেশ ও সমাজ পর্যবেক্ষণ, মানব মনের গহীন সাগরে অব-গাহনের প্রবণতা ও জীবনের অর্থ খোঁজার ঔৎসুক্য সহিত্যকে করেছে জীবনমুখী। সাহিত্য এখন আর শুধু আনন্দ লাভের নিমিত্তেই পাঠ করা হয় না, বরং জীবন ও জগতকে চেনার হাতিয়ার হিসেবেও পাঠক এর সান্নিধ্য সাগ্রহে কামনা করে। কখনও সাহিত্য পাঠককে নিয়ে যায় কোন কল্পলোকে, কখনও বা মন: জগতে আবার কখনও বা মার্কস, ভলতেয়ার বা রুশোর জগতে। অর্থ্যাৎ সাহিত্য পাঠে কল্পনা বিলাসী হয় ভাবুক আর জ্ঞান পিপাসু পরিণত হয় জ্ঞানীতে।

সাহিত্যের সমালোচনা করার যোগ্যতা আমার আছে বলে মনে করি না। তবে লেখা লেখির ঝোঁক ও নিজের উপলব্ধী অন্যের সাথে শেয়ার করার ধৃষ্টতাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি রচনা করতে। বিশ্বকরি রবীন্দ্রনাথের মত আমারও বলতে ইচ্ছে হচ্ছে যে কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, আর কাঁচা সমালো চনাও গালি- গালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দেবার ক্ষমতা খুব

তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি কোন পাঠকের পিপাসার্ত মনে সামান্যতম দাগও কাটতে সক্ষম হয় তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

গ্রন্থটিকে আঁতুরঘর থেকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা পর্যন্ত যে বন্ধুটি আমায়স র্বাধিক সহযোগীতা করেছে সে হলো 'মোঃ রাইসুল ইসলাম, নিউটন'। ওকে ধন্য বাদ দিয়ে দায়সারা ভাবে ঋণ শোধ করার ধৃষ্টতা দেখাতে চাই না। গ্রন্থটি প্রকাশ করতে আর একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সে হলো স্নেহেরহারুন-অর-রশীদ। তাঁর মত আত্ম নিবেদিত ও উদ্দ্যোমী বন্ধুর ঐকান্তিক সাহায্যেরঋণ শোধ করা যাবে না। এঁর কাছে আমি ঋণাবদ্ধ।

বইটির মান উন্নয়নে যে কোন সদুপোদেশ সাদরে গ্রহণযোগ্য

১৫ ই নভেম্বর ২০০০ ইং

এম. এলহাম হোসেন।

সূচীপত্র

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
সাহিত্য	০১
সাহিত্যের উদ্দেশ্য	০৭
শেকস্‌পীয়ার ও তাঁর ম্যাকবেথ	০৯
নাট্য সাহিত্যের গোড়ার কথা	১৪
শেকস্‌পীয়ারের নাটকে অলৌকিকতা	১৯
কবি ও কাব্য	২৪
সাহিত্যিক, তাঁর দেশ ও সমাজ	২৭
উপন্যাস, তার অঙ্গসংস্থান ও প্রকৃতি	৩১
সাহিত্যে রাজনীতি	৩৯
রোমান্টিসিজম	৪২
শিল্প বা আর্ট	৪৪
ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জনক	৪৬
রেনেসাঁ	৫০
মার্লোর ডক্টর ফস্টাস ও রেনেসাঁ	৫১
FAREWELL TO ARMS আত্মজীবনীমূলক নয়, বরং কল্প কাহিনী	৫৪
প্রথম মডার্ণ হিরো হ্যামলেট	৫৭
এজ ইউ লাইক ইট এ প্যারালেলিজম ও কনট্রাস্ট	৬০

সাহিত্য

'সাহিত্য' শব্দটির সাথে কার না পরিচয় আছে যে অন্তত এস. এস. সি. পাশটা করেছে ? কিন্তু আমরা এ শব্দটা বেশ ঢাক ঢোল বাজিয়ে উচ্চারণ করলেও এর প্রকৃত স্বরূপ বুঝার চেষ্টা বলতে গেলে খুব কমই করে থাকি। অবশ্য এজন্য দোষটা পুরোপুরি আমাদের- তা বলা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গতানুগতিক প্রশ্নপত্র, ত্রুটি পূর্ণ পরীক্ষা রীতিনীতি এবং আমাদের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্ত প্রবণতাই মূলত: এজন্য দায়ী। যাই হোক, ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।

সাহিত্য জীবন থেকে নির্গত, জীবনের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল এবং জীবনের দ্বারা পুষ্ট একটি জ্ঞানের শাখা। আসলে সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। সাহিত্যের পরিসর বা বিস্তৃতি এত বিশাল যে এটাকে একটা আটসাট সূত্রে ফেলা দূরহ। আর এজন্যই হেনরী হ্যালাম আইন শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব এবং চিকিৎসা শাস্ত্রকেও সাহিত্যের আওতায় ফেলেছেন। অন্যক্ষেত্রে চার্লস ল্যাম্ব সাহিত্যের ধারনাকে আর একটু আটসাট করেছেন যখন তিনি সাহিত্য থেকে Hume ও Gibbon এর লেখা বাইরে রাখতে চেয়েছেন। যদিও অনেক সাহিত্যের ইতিহাস লেখক হিউম ও গীবনের লেখা সাহিত্যের অন্তর্গত করতে দ্বিধা করেন নি।

ইংরেজী সাহিত্যের ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক ম্যাথিও আরনোল্ড (Mathew Arnold) সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "Literature is the expression of the best that is known and thought in the world." অর্থ্যাৎ সাহিত্য হলো সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান ও চিন্তার প্রকাশ। আর সাহিত্য যদি সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা ও চেতনার প্রকাশই হয় তবে আমরা Morley এর সাথে কণ্ঠ মিলাতেও দ্বিধা করব না যখন তিনি বলেন, "Literature consists of all the books where moral truth and human passion are touched with largeness, sanity and attractive form."

একজন প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন যে, যা কিছু ছাপা তাই সাহিত্য । কথাটা শুনে আমাদের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মেঘ ভীড় করে । আসলে এ কথার খেই খুজতে গেলে আমাদের যেতে হবে ডি. কুইন্সির কাছে যিনি

সাহিত্যকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। De Quincey এর মতে সাহিত্যকে দুইটি ক্যাটাগরীতে ফেলা যায়। এদের একটি হলো Literature of Knowledge এবং অপরটি হলো Literature of Power. Literature of Knowledge এর উদ্দেশ্য হলো পাঠককে শেখানো। অপর পক্ষে Literature of Power এর কাজ হলো মানুষকে move করা বা পাঠকের আবেগ অনুভূতিকে আন্দোলিত করা। সাহিত্যের এই শ্রেণী বিভাগকে আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যখন De Quincey Literature of Knowledge কে রাডার' এবং Literature of Power কে 'নৌকার বৈঠা' বা 'পালের' সাথে তুলনা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথমটা আলোচনা করে discusive understanding নিয়ে এবং দ্বিতীয়টা আলোচনা করে Higher understanding নিয়ে যার সাথে অপূর্ব সমন্বয় ঘটে আনন্দ ও সহানুভূতির।

আসলে ডি. কুইন্সি সাহিত্যকে পূর্বোক্ত দুই ভাগে ভাগ করেছেন এর দুইটি উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। একটি হলো didactic purpose (নীতিগর্ভ) এবং অপরটি হলো aesthetic purpose (নান্দনিক সৌন্দর্য সম্বন্ধীয়)। এই শ্রেণী বিভাগের উপর নির্ভর করে আমরা তাহলে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন শাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির উপর লেখা বইগুলোকে প্রথম ভাগে এবং শেক্সপীয়ারের নাটক, জন কীটস এর কবিতা (Odes) গুলোকে দ্বিতীয় ভাগে ফেলতে পারি। অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যে absolute বা পরম শব্দটার প্রয়োগ খুব কমই হয়।

যাই হোক, সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে বাক বিতন্ডা করাটা পরম বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহিত্য হলো উপলব্ধির একটি বিষয় যা'কে উপভোগ করতে হয় হৃদয় দিয়ে কারণ এটা মানুষের হৃদয়ের কথা বলে। আর এজন্যেই অ্যারিস্টটল যথার্থই বলেছেন যে, "Literature is the imitation of nature" এখানে nature বলতে অবশ্যই Human nature কে বুঝতে হবে আর তাহলে অনেক প্রশ্নের উত্তর এমনিতেই পাওয়া যাবে।

কিছু কিছু সাহিত্য কর্ম আছে যা পড়লে সহজেই উপভোগ করা যায়। অর্থ্যাৎ ইহা উপলব্ধির জন্য এর রচনার সমসাময়ীক কালের কোন ঘটনা বা কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে না জানলেও চলে। যেমন ধরুন Arabian Nights এর কথা। এটা উপভোগ করতে পাঠককে খলিফা মামুনুর রশীদের রাজত্বকালের রাজনেতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে না জানলেও চলবে। এ

ধরনের সাহিত্যকে ইংরেজীতে অবশ্য Absolute Literature বলা হয়। আবার কিছু কিছু সাহিত্য কর্ম আছে যা উপভোগ করতে আপনাকে এর রচনা কালের সমসাময়ীক বেশ কিছু তথ্য জানতে হয়। Dryden এর Macflecknoe যদি কেউ উপভোগ করতে চায় তবে তাকে Dryden এর সমসাময়ীক কবি Shadwell সম্বন্ধে কিছুটা হলেও ধারনা রাখলে ভাল হয়। Edmund Burke এর 'Speech And Conciliation With America' যদি কেউ উপভোগ করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই এর রচনাকালের পূর্ববর্তী সময়ের অ্যামেরিকা ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে হবে। এ ধরনের সাহিত্যকে Contingent Literature বলা যেতে পারে। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে, নির্ভেজাল Contingent বা Absolute Literature নাই বললেই চলে। যেমন ধরুন কেউ Jonathan Swift এর 'Gulliver's Travels' উপভোগ করতে চায়। সে যদি Swift এর সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা, Whig party কর্তৃক Tory party এর নেতৃবৃন্দের উপর অত্যাচার, রবার্ট ওয়াল পোল এর নির্লজ্জ রাজনৈতিক চাল, তৎকালীন সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা রাখে তবে সে এই বইটার Allegorical significance বেশ অনায়াসেই বুঝতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি এই বইটা শুধু উপভোগ করার উদ্দেশ্যে পূর্বোল্লেখিত ধারণা ছাড়াই পড়ে তবে সে বুঝবে যে বইটা কতই না চমৎকার। আর এজন্যই হয়ত 'Gulliver's Travels' সারা বিশ্বের জনপ্রিয় School Stories গুলোর একটি। বইটির গল্প কল্পনার রসে সিক্ত যার ফলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও উপন্যাসটি উপভোগ করে।

এবার আসা যাক পূর্বের আলোচনায়। আমরা দেখেছি যে, De Quincy সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। Literature of Knowledge এবং Literature of Power. তবে সাহিত্য কেবল জ্ঞানের কথার সামগ্রী নয়। জ্ঞানের কথা একবার জানা হয়ে গেলে তার তাৎপর্য ও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। আগুন উষ্ণ, সূর্য গোলাকার, পাথর কঠিন, পানি তরল - এগুলি তো জ্ঞানের কথা, কেবল তাই নয় বহু পুরাতন বিষয়। একবার জানা হয়ে গেলে বিষয় পুরাতন হয়ে যায়। কিন্তু সাহিত্য ভাবের কথা ; ভাবের বিষয় কখনও পুরাতন হয় না। নিত্য নতুন রূপে তা মনকে উদ্ভাসিত করে তোলে। সাহিত্য এই ভাবের বিষয়কে তার অন্তরের সামগ্রী করে তোলে। এজন্য সাহিত্য পুরাতন বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হলেও তা পুরাতন হয় না। জ্ঞানের কথা কখনও কখনও নতুন হতে পারে; কিন্তু তা তো অল্পকাল পরে সকলের ব্যবহারের ও প্রয়োগের দ্বারা নতুন ও সাধারণ হতে বাধ্য। তাছাড়া বর্তমানে যা কিছু গ্রহণীয়, আগামী দিনে হয়তো

তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু ভাব চিরন্তন - ভাবের প্রকাশ চিরন্তন ; তাই ভাবের প্রকাশের বাহন যে সাহিত্য, তাও চিরন্তনী। এজন্য হয়তো Jonson বলেছেন যে শেক্সপীয়ারের নাটকগুলো Eligabethan Age এ রচিত হলেও উহারা সর্বযুগের ও সর্বজাতির। আর Samuel Johnson তো বলেই ফেলেছেন যে, যখন শেক্সপীয়ারের নাটকের পাত্র পাত্রীরা কথা বলে তখন পাঠক মনে করে যে, সে নিজেই কথা বলছে ; ঠিক একই আবেগ কাজ করছে তার মধ্যে যা কাজ করছে শেক্সপীয়ারের পাত্র পাত্রীদের মধ্যে।

সাহিত্য এমন এক ভাবের ধারক যা সাহিত্যিকের অন্তর থেকে বের হয়ে পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করে। সাহিত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, এটা সর্ব সাধারণের। আর তাই হয়তো সাহিত্য সমালোচক ও কবি Whitehead বলেছেন, "There is nothing for the real world which is merely an inner fact. Every reality is there for feeling ; it promotes feeling ; and it is felt." ইংরেজী সাহিত্যের Romantic যুগের সাহিত্য যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখব যে, এ যুগের কবি সাহিত্যিকগণ ভাবের উপর জোর দিয়েছেন (Emotion recollected in tranquility). Romantic যুগের কবিগণ যে Principle অনুসরণ করতেন তা হলো Heart dominates over head. অর্থ্যাৎ সাহিত্যে যুক্তি তর্ক নয় বরং ভাবটাই আসল। মাথা থেকে আসে যুক্তি-তর্ক আর Heart (অন্তর) থেকে আসে ভাব। রবীন্দ্রনাথও ভাবের বিষয়কেই সাহিত্য বলেছেন। তবে Historical incident (ঐতিহাসিক ঘটনা) ও সাহিত্যে আসতে পারে ; তবে সেই বিষয়কে কোন ভাবমূর্তি নিয়ে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। ইংরেজী সাহিত্যের Neo-classical যুগের অর্থ্যাৎ Dryden এর Maturity থেকে Samuel Johnson এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত যে সাহিত্য তাতে আমরা যে সূত্রের প্রয়োগ দেখি তা হলো Head dominates over heart অর্থ্যাৎ Romantic যুগের Criteria এর সম্পুর্ন উল্টো। এ যুগের সাহিত্যে আমরা তৎকালীন রাজনৈতিক কপটতা (Corruption), সামাজিক অবক্ষয়, মানুষের নৈতিক অবক্ষয়, লেখকদের একে অপরের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষকেও ঠাঁই পেতে দেখি। যেমন ধরুন Dryden এর প্রসিদ্ধ 'MacFlecKnoe' তে আক্রমন করেছেন তার প্রতিপক্ষ Whig Party এর কবি Shadwell কে। এ কবিতায় কবির ব্যক্তিগত ক্রোধ প্রাধান্য পেয়েছে। রাণী অ্যানের রাজত্ব কালে (১৭০২-১৭১৪) রচিত 'The Rape Of The Lock' এ Alexander Pope দুইটি রোমান ক্যাথলিক পরিবারের ঝগড়া
মেটানের প্রয়াস চালিয়েছেন যা শুরু হয়েছিল মিসেস অ্যারাবোলা ফারমর এর বেণী কর্তনকে কেন্দ্র করে। যদিও এই প্রচেষ্টায় আলেকজান্ডার পোপ বেশ

ভাল ভাবেই ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং নতুন কিছু শত্রু তৈরী করেছিলেন। জোনাথান সুইফটের 'Gulliver's Travels' ও রাজনীতির রঙে রঞ্জিত। এতে লেখকের ব্যক্তিগত ঘৃণাও প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের মেকী ফ্যাশন ও কলুষিত নৈতিকতার প্রতি। Addision ও Steele এর Coverly Papers কে তো বলাই হয় Social Document. Henry Fielding এর Tom Jones ও কিন্তু তৎকালীন সমাজের চিত্রই অংকন করে। কিন্তু এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে এ লেখাগুলো ভাবসিদ্ধ কি-না, তবে উত্তরে নিঃসন্দেহে বলা যায় এগুলো অবশ্যই ভাবসিদ্ধ। এ রচনা গুলোর শিল্পগুণ এতটাই সমৃদ্ধ যে এগুলো কালের দোর্দন্ড প্রতাপকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আজও টিকে আছে এবং ইংরেজী সাহিত্য যতদিন থাকবে, ইংরেজ জাতি যতদিন থাকবে, ততদিন এই রচনাগুলোও থাকবে। আমরা Wordsworth কে Romantic কবি বলি, তাই বলে শেকস্‌পীয়ার যে Unromantic ছিল তা নয়। Shakespeare Wordsworth এর চাইতেও বেশী Romantic ছিলেন।

যে সাহিত্যের মধ্যে চিরন্তন সত্য (Truth) প্রকাশের রূপ লাভ করে তাই কালের উর্দ্ধে, স্থানের উর্দ্ধে, জাতির উর্দ্ধে উঠতে পারে। এই সত্য কখনও পুরাতন হয় না। এটা সবার মধ্যে সমান ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। সত্য যেমন ব্যক্তি নিরপেক্ষ, তেমনি বস্তু নিরপেক্ষ। এই সত্য কখন কোন একক ব্যক্তির কামনার গন্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। এটা ব্যাপ্ত হয় সর্বত্র। আসলে এই সত্যের ভিত্তিই হলো ভাব। ভাবের রাজ্যে কখন মিথ্যা ঠাঁই পায় না। আর এজন্যই স্যার ফিলিপ সিডনি বলেছেন যে, এই বিশ্ব চরাচরে একমাত্র কবিরাই সবচেয়ে কম মিথ্যা কথা বলেন। ইংরেজ কবি জন কীটস সত্যের সন্ধান করেছেন সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে। এই সৌন্দর্য কখনও পুরাতন হয় না। তাই তিনি Grecian Urn এর বাহ্যিক গাত্রে অংকিত ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন যে, এটা যুগে যুগে মানুষকে নতুন নতুন ধারণা দান করবে। আসলে সাহিত্য তো এটাই। সাহিত্য হলো ভাবের সমুদ্র যেখানে অবগাহন করলে নতুন নতুন চিন্তা চেতনার ছাপ পড়ে আমাদের মনে ; যেখানে ডুব দিলে নতুন নতুন চিন্তার মণি মুক্তা পাওয়া যায়। যেকোন ভাল সাহিত্যিকের Poetic Creed তো এটাই। আর এজন্যই হয়তো হেনরী এলারশ জন কীটস সম্মন্ধে বলেছেন, "The whole of Keats's poetic creed was the identification of truth with beauty." আসলে জন কীট্‌সের ক্ষেত্রে এখানে Beauty (সৌন্দর্য) বলতে Beauty of sorrow and of joy এবং Beauty of moral being and of the spirit কেই বুঝাচ্ছি।

এতক্ষণ যে ভাব বা Emotion এর উপর কথা বলা হলো তা আর একটু ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের বাংলা সাহিত্যের রবীনাদ্রনাথের কাছে যেতে হবে। তাঁর মতে কবি ও সাহিত্যিক কলা কৌশল পূর্ণ রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের ভাবময় দেহ সৃষ্টি করেন। এক একজন সাহিত্যিক তার নিজের মত করে কলা কৌশল সৃষ্টির দ্বারা সাহিত্য গড়ে তোলেন। সাহিত্যের মধ্যে লেখক নিজেকে অমর করে রাখেন ভাবের মধ্যে নয় কিংবা বিষয়ের মধ্যে তাঁর অমরত্ব লাভের সম্বাবনা কম। অবশ্য ভাব ব্যতীত ভাবের প্রকাশ সম্ভব নয়। ভাবের সহিত ভাব প্রকাশের উপায় সম্মিলিত ভাবেই বুঝায় সাহিত্য সৃষ্টি। ভাব সকলের, ভাব প্রকাশের উপায়টি কিন্তু লেখকের। এই দুইকেই অবলম্বন করে সাহিত্যের সৃষ্টি।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

প্লেটোর মতে হোমার ও হেসিওডের রচনার কিছু কিছু অংশ যুবকদের কাছ থেকে দুরে রাখাই ভাল কারণ এসব অংশ নাকি দেব দেবীর ব্যাপারে ভুল ও কুরুচিপূর্ণ বর্ণনা সমৃদ্ধ।

অসলে সাহিত্যের কাজ বা উদ্দেশ্য কি ? সাহিত্য শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো সহিত চল। কার সাথে চলবে সাহিত্য। জীবনের সাথে। মানব জীবনের সাথে। শুধু তাই নয়। সাহিত্য জীবন চলার পথও বাতলে দেয়। যে সাহিত্য ন্যাক্কারজনক কথোপোকোথন বর্জিত, যে সাহিত্য Vulgarity বা নোংরা চর্চাকে নিরুৎসাহিত করে, সেই সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য। অর্থ্যাৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো Moralistic. সাহিত্য যেমন সৎ কাজের উৎসাহ প্রদান করে, তেমনি মন্দ কাজের তীব্র সমালোচনাও করে থাকে। সমাজের মানুষের নৈতিক অধ:পতন, রুচির বিকৃতি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করে সাহিত্য। এত করে চোখ-কান খোলা মানুষ পায় সাহিত্য থেকে সুন্দর ভাবে বাঁচার Guide line. অনেক সাহিত্য কর্মই তো অনেক বর্বর শাসককেও দমিয়ে দিয়েছে। তাদের ভাল মানুষি চেহারার অন্তরালে লুক্কায়িত আসল স্বরূপ উৎঘাটন করেছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান।

যে সাহিত্য শুধু রাস্তার কিছু লোককে খুশি করার নিমিত্তে রচিত হয় তা কখনও স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসতে পারে না, সর্ব সাধারণের হৃদয় মন্দিরে। সাহিত্য এমন এক অমৃত সুরা যা পান করে সবাই মাতাল হয়ে যায়। সাহিত্য এমন এক পরশ পাথর যা সমাজের ভেতর বাহির বদলে দেওয়ার প্রচন্ড ক্ষমতা ধারণ করে। একজন সত্যিকারের সাহিত্যিক একজন শক্তিশালী দার্শনিকও বটে। তাঁর সাহিত্যে বর্তমান যেমন প্রাণবন্ত, ভবিষ্যতের কল্পচিত্রও তেমনি সমান ভাবে প্রাঞ্জল। চরম ও পরম সত্যকেই যেন তিনি একটা ফ্যান্টাস্টিক জগত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেন। সাহিত্যিকের সৃষ্ট জগতের পরিধি অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত। সীমার মাঝে তিনি অসীমের সন্ধান পান। তাঁর সীমাহীন জগতের বাসিন্দা কোন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের নয়, কোন ছকে বাধা নিয়মে চলা মানুষের নয়। তাঁর জগত সবার জগত। তাঁর সৃষ্টিতে আছে সবার উত্তরাধিকার।

তবে হ্যাঁ, সাহিত্যে শুধু নীতিকথা বা Moral থাকলে তা অনেক পাঠকের কাছে গ্রহণ যোগ্য নাও হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকার জাতীয়

কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের Leaves of Grass (লিভ্‌স অব গ্রাস) অনেক বৎসর অনেক সম্মানিত ব্যক্তির রিডিং রুমে প্রবেশাধীকার পায় নি।

অনেক বিশ্ব বরেণ্য কবিই সাহিত্যে নীতি কথার কচ কচানি পছন্দ করেন নি। জন কীট্‌স তো বলেই ফেলেছিলেন যে, তিনি কবিতায় উপদেশ দেওয়াকে ঘৃণা করেন। তবে এস. টি. কলেরীজ অবশ্য মনে করেন যে, কবিতার প্রধান কাজ আনন্দ দেওয়া। যদি এটা কিছু উপদেশ দেয়ই, তবে সেটা আনন্দের মধ্য দিয়ে দেবে। কিন্তু এহেন মনোভাব তো একথাই বলে যে, আর্ট আর্টের জন্য অর্থ্যাৎ শিল্পের জন্য শিল্প। কিন্তু যে শিল্পের জীবনের সাথে সামঞ্জস্য নেই। যে শিল্প মানুষকে নিয়তির সাথে সংগ্রাম করতে প্রেরণা জোগায় না, সে শিল্প তো দীর্ঘায়ূ হতে পারে না। সে জন্যই হয়তো আধুনিক যুগে রোমন্টিক কবিতার ধারা বিলুপ্ত প্রায়।

সাহিত্য যেমন একটা জাতির চিন্তা ও চেতনার ধারক ও বাহক, তেমনি এটা জাতিকে চিন্তা করতে বা চিন্তা করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেয়। আধুনিক বাংলা বা ইংরেজী সাহিত্য আধুনিক কালের বিভিন্ন মতবাদ বা ইজম, দার্শনিক চিন্তা ভাবনা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তার বাস্তব ধর্মী প্রয়োগ ইত্যাদির দ্বারা সম্পৃক্ত। আধুনিক যুগের বাস্তব জীবনের জটিল আবর্তে ঘুরে ঘুরে সাহিত্য এক জটিল রূপ ধারণ করেছে। কারণ সাহিত্য তো জীবনেরই আয়না স্বরূপ। কিন্তু এ জটিল জীবন থেকেই সাহিত্য ছেঁকে বের করে আনে ভাব ও ভাবনা যা পাঠককে দেয় অফুরন্ত ও অভিনব অনুভূতি। জ্ঞানের কথা পুরাতন হয়, কিন্তু ভাব কখনও পুরাতন হয় না। ভাব সর্বদাই নতুন। আর এই নতুনের চিরঞ্জীব ধারকই হলো অমর সাহিত্য।

শেক্সপীয়ার ও তার ম্যাকবেথ

একজন প্রখ্যাত রাশিয়ান সমালোচক বলেছেন যে, স্রষ্টার পরেই যিনি বেশী সৃষ্টি করেছেন তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন শেক্সপীয়ার। আসলে স্রষ্টার সাথে শিল্পীকে এক অর্থে তুলনা করা চলে। মহান স্রষ্টা যেমন এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছেন, একজন গুণী শিল্পীও তেমন তাঁর আপন প্রতিভায় এক নতুন রঙ্গীন বিশ্ব সৃষ্টি করেন। স্রষ্টার পৃথিবী যদি ব্রোঞ্জের তৈরী হয়, শিল্পীর পৃথিবী হবে সোনার মত ঝলমলে। কারণ এতে সে কল্পনার রং তুলী আপন মনে ব্যবহার করে। আসলে শেক্সপীয়ার তাঁর আপন কল্পনা মহিমায় মানব মনের যে সুক্ষ চিত্র অংকন করেছেন তাঁর অমর নাটক গুলোতে তার তুলনা বিশ্ব সাহিত্যে মেলা ভার। শেক্সপীয়ারের নাটক গুলো এক একটি সমৃদ্ধ খনি যাতে অফুরন্ত সম্পদ রক্ষিত রয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, শেক্সপীয়ারকে শুধু একজন ব্যক্তি বললে ভুল হবে। তিনি একটি ব্যক্তি নন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান যা একদিনে গড়ে ওঠেনি। শেক্সপীয়ার নামক এ প্রতিষ্ঠানটি প্রায় চারশ বছর ধরে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রায় সব লোক এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই বললেই চলে যেখানে শেক্সপীয়ারের নাটক মঞ্চস্থ করা হয়নি। যাই হোক এবার প্রসঙ্গে এসে বলা যায় যে, শেক্সপীয়ার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে পৃথিবীর সব মানুষের সমান পদচারণা ও সমান অধিকার চলে। শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে স্রীন্ডবার্কের উক্তিটি শুনলে হয়ত সবাই অবাক হবেন। তিনি বলেছেন, "মানুষ [redacted] অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু শেক্সপীয়ারকে নয়।" যুগ যুগ ধরে মানুষ যেমন স্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যস্ত, তেমনি শেকস্পীয়ারের স্বরূপ নির্ণয়েও কত সাহিত্যিক, কত সমালোচনা, কত গবেষক, কত পন্ডিত যে মাথা ঘামিয়েছেন এবং ঘামাচ্ছেন তার শেষ নেই। শেক্সপীয়ারের নাটক গুলো বনের মত যেখানে অন্যান্য নাট্যকারদের নাটক গুলো বাগানের মত। বাগানে হাতে গোনা কয়েকটি গাছ থাকে, আর বনে থাকে অসংখ্য গাছ। একথা বলার উদ্দেশ্য হল যে, শেক্সপীয়ারের নাটক গুলোকে আমরা এক এক দৃষ্টি কোণ থেকে দেখলে এক এক রকম রস পাই। শেক্সপীয়ারের নাটকে কেউ খুজেছেন জীবনের মানে, কেউ দার্শনিক

তাৎপর্য, কেউ উপমা-অলংকার, কেউবা রসমুলক উপাদানের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। আসলে শেক্‌সপীয়ারে কি নেই।

ইংরেজ জাতির গর্বের মধ্যমণি হলেন শেক্‌সপীয়ার। ইংরেজ জাতিকে যদি বলা হয় যে, শেক্‌সপীয়ার আর ভারত বর্ষের মধ্যে তোমরা কোনটিকে চাও, তবে তারা নির্দিধায় উত্তর দেবে যে, আমরা শেক্‌সপীয়ারকে চাই। এ প্রসঙ্গে কার্লাইলও তাই বলেছেন। আমরা আগেও বলেছি যে, পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই বললেই চলে যেখানে শেক্‌সপীয়ারের নাট্যচর্চা হয়না । সোভিয়েত রাশিয়া শেক্‌সপীয়ারকে নিয়ে যতটা উৎসাহ দেখায়, তা দেখে হয়ত ইংরেজদেরও হিংসার উদ্রেক ঘটবে। এজন্যই হয়ত ডোভার উইলসন বলেছেন, "Here is something that may fill both actors and scholars with envy in this country." আমাদের দেশের শেক্‌সপীয়ারের সাথে পরিচয় ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে। একজন লেখক বলেছেন যে, উনিশ শতকের পর থেকে বাঙ্গালীরা শুধু শেক্‌সপীয়ারকে পাঠই করেনি, পূজাও করেছে। নিরদ চৌধুরী তাঁর Autobiography of an unknown Idian তে বলেছেন যে, মানুষ যেমন করে ভগবানকে পূজো করে, বাঙ্গালীরাও তেমনি শেকস্‌পীয়ারের পূজো করেছে। হিন্দু কলেজের ছাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো এক রকম অংক কষে প্রমাণ করতেই বসেছিলেন যে শেক্‌সপীয়ার নিউটনের চাইতে বড়।

শেক্‌সপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' স্কটল্যান্ডের পটভূমিতে রচিত অন্যতম ট্রাজেডি। এ নাটকটি রচিত হয় রাজা জেম্‌সের আমলে। আসলে জেম্‌স ইংরেজী শব্দ যার ল্যাটিন প্রতিশব্দ হলো জেকব। সেই জন্যে জেম্‌সের রাজত্ব কালকে (১৬০৩-২৫) জেকোবিয়ান পীরিয়ড বলা হয়। বস্তুত পক্ষে রাজা জেম্‌সই যুক্তরাজ্যের প্রথম অধিপতি ছিলেন। যিনি রাণী এলিজাবেথের ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহনের পূর্বেই ৬ষ্ঠ জেম্‌স নাম ধারণ করে স্কটল্যান্ড শাষন করতে শুরু করে। রানী এলিজাবেথ যেহেতু ছিলেন অবিবাহিত, বিধায় তার মৃত্যুর পর তার ভাগিনা জেম্‌স ইংল্যান্ডের ক্ষমতায় বসেন। রাজা জেম্‌সও শেক্‌সপীয়ারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং শেক্‌সপীয়ার যে নাট্যদলে প্রবেশ করেছিলেন তার নাম লর্ড চেম্বার লেইনের দল যা ১৬০৩ সালে রাজার দলের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেই সূত্রে শেক্‌সপীয়ারকে রাজদরবারে Groom of Chamber এর মর্যাদা দেওয়া হয়।

শেক্‌সপীয়ার তাঁর বিখ্যাত 'ম্যাকবেথ' নাটকটি রাজা জেম্‌সের অনুরোধেই লিখেছিলেন। রাজা জেম্‌সের সম্বন্ধী যিনি ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ খ্রীষ্টিয়ান - বেশ কিছুদিন ধরে ইংল্যান্ডে আসার কথা ; কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধার কারণে তিনি সঠিক দিনক্ষণে আসতে পারেননি।

অবশেষে ১৬০৬ সালের ৬ই জুলাই তিনি সদলে হাজির হন রাজা জেম্‌সের দরবারে। সম্ভবত তাঁদের সামনে অভিনয়ের জন্যই রাজাদেশে শেক্‌সপীয়ার এ নাটকটি রচনা করেছিলেন।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে শেক্‌সপীয়ার এ নাটকের উৎস কোথায় পেয়েছিলেন ? আসলে ম্যাকবেথ নাটক রচনায় হলিনশেড এর 'ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের ইতিবৃত্ত' বেশ সহায়তা করেছে। শেক্‌সপীয়ারের বয়স যখন ষোল বছর তখন মৃত্যু হয় হলিনশেডের। হলিনশেড প্রতিভাধর বা মৌলিক লেখক নন। তিনি নানা উপাদান সংগ্রহ করে ইতিবৃত্ত রচনা করেন।হলিনশেডকে আমরা আজ চিনি কারণ শেক্‌সপীয়ার তাঁর ইতিবৃত্ত থেকে অনেক উপাদান নিয়ে নাটক লিখেছেন। তবে একথা কখনই বলা চলবে না যে শেক্‌সপীয়ার হলিনশেডের ইতিবৃত্তের অন্ধ অনুকরণ করেছেন। হলিনশেড চরিত্রগুলোর নামগুলো সরবরাহ করেছেন কিন্তু চরিত্রগুলো শেক্‌সপীয়ারের একেবারেই নিজস্ব সৃষ্টি। চরিত্র অংকনে বিশ্ব সাহিত্যে শেক্‌সপীয়ারের সমকক্ষ লেখক খুবই কম। হলিনশেড শুধু ম্যাকবেথ নাটকের উপাদান যুগিয়েছেন আর সেই উপাদান নিয়ে শেক্‌সপীয়ার সৃষ্টি করেছেন এক অমর ট্রাজেডি। হলিনশেডের ঘটনা বলী নিছক গদ্যাত্মক বর্ণনা - যা থেকে আমরা শুধু তথ্য অবগত হতে পারি, কিন্তু শেকস্‌পীয়ার এই নিরস ঘটনাবলীকে নাট্যরসে সিক্ত করেছেন। এই গদ্যাত্মক বর্ণনাকে কাব্যিক ছন্দে রঙ্গীনভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই নাটকে মাত্র সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ গদ্য আর বাকি বিরানব্বই দশমিক পাঁচ শতাংশ পদ্য বিদ্যমান।

শেক্‌সপীয়ার খুব ভাল করেই জানেন কিভাবে নাটকে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে হয়। হলিনশেডে আছে যে, চারজন ভাড়াটে লোক দিয়ে রাজাকে খুন করা হয়। কিন্তু শেক্‌সপীয়ার এই নিরস ঘটনাকে পরিবর্তিত করে দেখান, ম্যাকবেথ কিভাবে লেডি ম্যাকবেথের সহায়তায় ডানকানকে হত্যা করে এবং তা নাটকে একটি সংকটময় পরিস্থিতির সূচনা করে। এজন্যই হয়ত এস্থোলোজি ও প্রোজের লেখক হোগার্থ সূচনায় বলেছেন যে, একজন সাধারণ লেখক কিছু লিখলে সে লেখাটা হয় পানির তূল্য, অপর পক্ষে একজন সৃজনশীল লেখক কিছু লিখলে সে লেখাটা সুরায় পরিণত হয় যাতে উত্তেজক ক্ষমতা বিদ্যমান।

এখন আমরা সংক্ষেপে দেখার চেষ্টা করব কিভাবে শেক্‌সপীয়ার হলিনশেডের পরিবর্তন সাধন করলেন। হলিনশেডে ম্যাকডোনাল্ডের বিদ্রোহ, নরওয়ের রাজা সিউনোর অভিমান ও সিউনোকে পরাজিত করার ফলে প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্দীপ্ত ইংল্যান্ডের অধিপতি ক্যানিয়ুটের আক্রমন বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। শেক্‌সপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকের সুচনায় ম্যাকডোনাল্ডের বিদ্রোহ এবং

একই দিনে সিউনোর অভিযান দেখানো হয়েছে। কিন্তু ক্যানিয়ুটের আক্রমন দেখানো হয়নি। এর সম্ভাব্য কারণ, হয়ত শেক্সপীয়ার ম্যাকবেথের চরিত্রকে উজ্জ্বলতর করতে চেয়েছেন। এছাড়া হলিনশেডে আমরা দেখি ম্যাকডোনাল্ড আত্মহত্যা করে। কিন্তু শেক্সপীয়ারে ম্যাকবেথ নিজেই ম্যাকডোনাল্ডকে হত্যা করে। হলিনশেডে ব্যাঙ্কোকে খুন করা হয় ভোজসভা থেকে ফিরে যাবার পথে। কিন্তু শেক্সপীয়ারে আমরা ব্যাঙ্কোকে খুন হতে দেখি ভোজসভায় আসার পথে। ফলে ব্যাঙ্কোর প্রেতের দৃশ্যের অবতারণা করা শেক্সপীয়ারের পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়েছে। হলিনশেডে ডানকানকে দূর্বল চিত্তের ভীরু রাজা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে দয়ামায়া পূর্ণ। কিন্তু শেক্সপীয়ার ডানকানকে সত্যিকারের রাজা হিসেবেই অংকন করেছেন। এর প্রমাণ ম্যাকবেথের উক্তিতে ধরা পড়ে যা উল্লেখিত আছে প্রথম অংকের সপ্তম দৃশ্যের ষোল থেকে বিশ নম্বর লাইনে। হলিনশেডে ম্যাকবেথ একটি উজ্জ্বল চরিত্র যেখানে শেক্সপীয়ারে ম্যাকবেথের উজ্জ্বল রূপ শেষের দিকে ম্লান হয়েছে। হলিনশেডের ইতিবৃত্তে ব্যাঙ্কো একটি সাধারণ চরিত্র। সে ম্যাকবেথের একান্ত বিশ্বাস ভাজন। কিন্তু শেক্সপীয়ারে ব্যাঙ্কো নিষ্পাপ। হলিনশেডের ব্যাঙ্কোর হাত ছিল ডানকানের হত্যার পিছনে। কিন্তু শেক্সপীয়ারের ব্যাঙ্কো একেবারেই মহিমান্বিত চরিত্র। সম্ভবত রাজা জেমসকে খুশি করার জন্যই শেক্সপীয়ার এমনটি করেছেন কারণ রাজা জেমস নিজেকে ব্যাঙ্কোর বংশধর বলে মনে করতেন। লেডী ম্যাকবেথের চরিত্রটি একান্তভাবে শেক্সপীয়ারের সৃষ্টি।

শেক্সপীয়ার একজন সত্যিকারের নাটক স্রষ্টা তা বুঝা যায় তাঁর 'ম্যাকবেথ' নাটকের কিছু বিশেষ দিকের মধ্যে। এ নাটকের সূচনা হয়েছে বিজন প্রান্তরে তিন ডাকিনীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। থম থমে পরিবেশ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পরিবেশটা ভৌতিক। এমন থম থমে পরিবেশ নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান। তিন ডাকিনী যে কথাটির উচ্চারণ করে "Fair is foul, foul is fair" তা সমস্ত নাটকের প্রধান উপজীব্য। যে ম্যাকবেথকে নাটকের শুরুতে একজন যোগ্য, কর্তব্য পরায়ণ ও ন্যায়নীষ্ঠ দেখি সেই শেষ পর্যন্ত এক ঘৃণ্য কসাইয়ে পরিণত হয় যে রক্তের হোলি খেলায় আনন্দ উপভোগ করে। এ নাটকের ড্যাগার দৃশ্য দর্শকদের কল্পনার উপর যথেষ্ঠ প্রভাব ফেলে। লেডী ম্যাকবেথের ঘুমন্ত সঞ্চরণ শেক্সপীয়ারের অতুলণীয় সৃষ্টি। মানুষের মানসিক ক্রিয়াকলাপ যে শারিরীক অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে দেখানো যায়, তা শেক্সপীয়ার বেশ সিদ্ধ হস্তে অংকন করেছেন। এটাকে টি. এস. ইলিয়ট অবজেকটিভ কোরিলেটিভ বলেছেন। এর অপর নাম অরগানিক মেটাফোর।

আর একটা কথা না বললেই নয় তা হলো, জেমস রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। রাজার ক্ষমতার উৎস স্বয়ং স্রষ্টা। সুতরাং রাজা কোন মানবীয় শক্তির কাছে দায়ী নন। রাজার অধিকার অস্বীকার করার উৎস স্রষ্টার কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। ১৬০৯ সালে তিনি পার্লামেন্টের এক যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, রাজাগণ এই পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধী। আর একটা কথা জানা দরকার। রাজা জেমস্ রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিলেন। এ কারনেই তিনি তাদের ব্যাপারে কঠোর আইন প্রণয়ণ করেন। এর কারণে ক্যাথলিকরা তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ১৬০৫ সালের ৫ই নভেম্বর পার্লামেন্টসহ রাজাকে উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়। ইতিহাসে এটিকে **Gun Powder Plot** নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু এই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায় এবং রাজা বেঁচে যান। এর পর রাজার জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়ে যায়। জনসাধারণের এই মনোভাব শেকস্‌পীয়ারকে 'ম্যাকবেথ' লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল অনেকটা।

নাট্য সাহিত্যের গোড়ার কথা

সাহিত্যে বুৎপত্তি সম্পন্ন কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এমন চারজন ট্রাজেডি রচয়িতার নাম বলুন যারা আপন সৃষ্টির মহিমায় বিশ্বসাহিত্যে সমুজ্জ্বল ও অমর হয়ে আছেন। তবে তিনি অকপটে উত্তর দেবেন যে, এঁরা হলেন ঈস্কিলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস ও উইলিয়াম শেকস্পীয়ার। এঁদের প্রথম তিনজনই গ্রীক নাট্যকার এবং চতুর্থ জন ইংরেজ। প্রথম দুইজন গ্রীক নাট্যকার শেকস্পীয়ারের চাইতে কোন অংশে কম নন প্রতিভার দিক দিয়ে, বরং ঈস্কিলাস নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

এখন যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এমন দু'জন কমেডি রচয়িতার নাম বলুন যারা আপন মহিমায় বিশ্ব সাহিত্যে সমুজ্জ্বল। তবে আপনি হয়ত বলবেন, এঁরা হলেন এরিস্টোফেনিস যাকে প্রাচীন গ্রীসের সর্বপ্রথম সাহিত্য সমালোচকও বলা হয়, এবং অপর জন হলেন সপ্তদশ শতকের মলিয়ার (ফরাসী লেখক)। একটু লক্ষ্য করলে দেখব যে, উল্লেখিত বিশ্বসেরা তিনজন ট্রাজেডি লেখক ও একজন কমেডি লেখক - এরা সবাই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের লেখক। আসলে বিশ্বসাহিত্যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্সের অবদান সত্যি বিস্ময়কর। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, সংগীত-ভাস্কর্যে, চিন্তা-ভাবনায়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলনে এবং মানবিক মূল্যবোধ নির্ণয়ে এথেন্সের অবদান মানব সভ্যতার ইতিহাসে অতুলনীয়। এথেন্সে খ্রী: পু: পঞ্চম শতকে ট্রাজেডি ও কমেডির চরম উৎকর্ষ সাধিত হলেও এর মূলে রয়েছে কয়েক শতকের ঐতিহ্য। মনে রাখা আবশ্যক যে, ট্রাজেডি ও কমেডির উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করা সহজ সাধ্য নয়।

আমাদের একান্তভাবে মনে রাখতে হবে যে, ট্রাজেডি ও কমেডি - এই দুই শ্রেণীর নাটকের মূলেই প্রোথিত আছে গভীর ধর্ম বিশ্বাস । একটু চোখ কান খোলা রাখলে দেখা যাবে যে, গ্রীক নাটক একান্তভাবে ধর্মবোধ প্রসূত। শস্য, সুরা ও উর্বরতার দেবতা হলো ডায়োনিসাস। এই ডায়োনিসাসের পুজা থেকেই ট্রাজেডি ও কমেডির উৎপত্তি। গ্রীক মিথোলোজি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ডায়োনিসাস ন্যাসা পর্বতে সূরা আবিষ্কার করে। আর এই সূরা বা মদ আবিষ্কারের জন্যই সে গ্রীকদিগ কর্তৃক পূজিত হয়। ডায়োনিসাস এর অপর আর একটি নাম আছে - আর তা হলো বাক্কাস।

বাক্কাসের অনুচররা দেখতে অর্ধেকটা ছাগের আকৃতির। এদেরকে স্যাটার বলা হতো। এইসব অনুচর নিয়ে ডায়োনিসাস সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতেন এবং মদ্য পানে মত্ত হতেন। সারা দুনিয়া চষে বেড়ানোর পর এরা আসে আর্গসে। আর্গস এমন একটা অঞ্চল যেখানে প্রাচীন এথেন্সের নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর্গসে এই নবীন দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির তৈরী করে নিত্য গীতের আয়োজন করা হয়। লোকজন সমবেত হয়ে ডায়োনিসাসের পূজো করত এবং সমস্বরে গান গাইত। এই গান থেকেই ডিথিরাম্বের উদ্ভব হয়।

মনে রাখা আবশ্যক যে, এই ডিথিরাম্বকে সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না যদিও পরবর্তী কালে নাটক সৃষ্টির ব্যাপারে এর ভূকি অনস্বীকার্য। ডথিরাম্বকে যে কারণে সাহিত্য বলা হয়না তা হলো এটা লিখিত নয় এবং আঙ্গিকের দিক দিয়ে এটি সুগঠিত ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেনি। ডিথিরাম্ব একটি নির্দিষ্ট রূপ পায় যথাসম্ভব খ্রী: পু: ৬ষ্ঠ শতকে যখন করিন্থের কবি এরিয়ন এ ব্যাপারে মনোযোগ দেন। এই ডিথিরাম্ব পঞ্চাশ জন গায়ক মিলে গাইত। এই গায়ক দলই কোরাস নামে পরিচিত। এটা কালক্রমে এথেন্সে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই কোরাসের একজন নেতা থাকত। একে এগজারকন বলা হয়।

আসলে এরিয়নের ডিথিরাম্ব থেকেই ট্রাজেডির উদ্ভব। কেউ কেউ এই কোরাসকে ট্রাজেডির নিউক্লিয়াস বা প্রাণকেন্দ্র বলেছেন। আমরাও যদি এদের সাথে সুর মিলাই তবে দোষ নেই কারণ একথা সত্য। ডিথিরাম্ব ও ট্রাজেডি দুটি সমানতালে চলে বেশ কিছুদিন। কিন্তু কালক্রমে এই ডিথিরাম্ব দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় - একটি নৃত্যগীত সমৃদ্ধ এবং অপরটি নাট্যরস সম্বলিত। কালক্রমে দেখা যায় যে, এথেন্সে নাট্যগীত সম্বলিত ডিথিরাম্বের চাইতে নাট্যধর্মী ডিথিরাম্ব অধিক থেকে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। যদিও ডিথিরাম্বে ডায়োনিসাসের বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তথাপি ধীরে ধীরে গ্রীক পুরাণের কাহিনী নিয়ে নাটক, বিশেষ করে ট্রাজেডি রচিত হতে থাকে।

ট্রাজেডির উৎস খুঁজতে গেলে আমরা দেখব যে, এই ডিথিরাম্ব থেকেই ট্রাজেডির উৎপত্তি। এরিস্টটলও তাই মনে করেন। যদি আর একটু গভীরে যাই তবে দেখব যে, গ্রীক শব্দ ট্রাগৈডিয়া (Tragoidia) বা (Goat Song) থেকে ট্রাজেডির উৎপত্তি ঘটেছে। আসলে গ্রীক শব্দ ট্রাগোস এর অর্থ হলো ছাগ। ধারণা করা হয় যে, ডিয়োনিসাসের মন্দিরে কোরাস ছাগ চর্ম পরিধান করে নৃত্যগীতে লিপ্ত হতো। এরা দেবতার উদ্দেশ্যে একটি ছাগও বলি দিত। যেহেতু একটি

জীবের প্রাণ হরণ করা হতো তাই ডিথিরাম্বের সুর হতো করুণ। আর এই করুণ সুর থেকেই উদ্ভব হলো করুণ রসের নাটক ট্রাজেডি। ট্রাজেডির সূচনা লগ্নে ট্রাজেডরি সাথে ছাগের একটা নিবির সম্পর্ক ছিল। এমনও হতে পারে যে, ছাগ হচ্ছে কামনা ও উর্বরতার প্রতীক আর ডায়োনিসাস হচ্ছে উর্বরতার প্রতিভূ।

যাই হোক ট্রাজেডি যার হাতে রূপ লাভ করে সে আর কেউ নয়, সে হলো থেসপিস। থেসপিস এটিকার ইকারিসার অধিবাসি যেখানে ডায়োনিসাসের পূজো হতো। থেসপিস সর্বপ্রথম একটি চরিত্রের অবতারণা করেন নাটকে। তিনি নিজেই কোরাস নেতার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। প্রথমে মুখে রং মেখে অভিনেতারা অভিনয় করতেন। পরে অভিনেতারা কাপড়ের মুখোশ পড়ে অভিনয় করতেন।

অতপর ঈস্কিলাস ট্রাজেডিকে আরও সমৃদ্ধ করেন আরো একটি চরিত্রের অবতারণার মধ্য দিয়ে। ঈস্কিলাসের নাটকের ঘটনাগুলো যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাইত তা হলো পাপ (Sin) ও শাস্তি। যেহেতু পাপের শাস্তি একটি নাটকের সীমিত পরিসরে দেখানো সম্ভব নয়, তাই ঈস্কিলাস তিনটি করে ট্রাজেডি একসাথে লিখতেন। এট্রেউস তার ভাই থায়েস্টিসকে তার নিজ সন্তনের গোস্ত খাইয়ে যে পাপ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁর পুত্র এগামেমনন যে প্রাণ হারায় তাঁরই স্ত্রী ক্লিটেমনেস্ট্রার হাতে। স্বামীর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা ও স্বামীকে হত্যা করার জন্য সে যে পাপ করলো তার শাস্তি দেয় অরিস্টিস যে ক্লিটেমনেস্ট্রারই ছেলে। আবার অরিষ্টস যেহেতু মাতৃহত্যা করে পাপ করল তার জন্য তাকে নেয়া হলো এপোলোর দরবারে যেখানে সে ক্ষমা পেল। সেই সাথে সাথে বংশ পরম্পরায় বর্তিত পাপের স্খলন হলো। আসলে ঈস্কিলাসকেই সত্যিকারের ট্রাজেডী স্রস্টা বলা যায়।

সফোক্লিস ট্রাজেডিতে আরও একটি চরিত্রের অবতারণা করেন। তার অমর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে কিং ঈডিপাস নাটকটি উল্লেখযোগ্য। মানুষ যে নিয়তির হাতের ক্রিড়ানক তা এই নাটকে মর্মান্তিক ভাবে ফুটে উঠেছে। ঈডিপাস যতই সংগ্রাম করে ভাগ্যকে পাশ কেটে চলার, যতই আস্ফালন করে নিয়তির অমোঘ বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে, ততই সে মারাত্মক ভাবে জড়িয়ে পড়ে নিয়তির জালে। তাই বলে মানুষ যে নিয়তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না তা নয়। কে-না জানে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই বলে কি সবাই মরার আগেই মরার ভয়ে খাওয়া, ঘুম, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে ? না। মানুষ নিয়তিকে

অমোঘ জেনেও নিয়তির সাথে যুদ্ধ করে। আর যুদ্ধ করে বলেই সভ্যতার চাকা আজও ঘুরছে। কবর সাড়ে তিন হাত বলে আমরা বাস করার জন্য সাড়ে তিন হাত বাড়ি তৈরী করি না। এটাই তো নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই চরম সত্যটি মহাকবি হোমারের ইলিয়াডেও উদ্ভাসিত হয়েছে।

গ্রীক নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে ইউরিপিডিসের ভূমিকা কম নয়। তাঁর বিখ্যাত নাটক মিডিয়া ও হিপ্পোলিটাস এ তিনি যে হিউম্যান সাইকোলোজির স্টাডি দেখিয়েছেন তা অনবদ্য।

কমেডি - নাট্য সাহিত্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। কমেডি কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ Komoidia থেকে যার অর্থ একদল হৈ হুল্লোর কারীর গান। ডায়োনিসাসকে উপলক্ষ করে গ্রামের লোকজন যে হৈ হুল্লোর করে বেড়াতো তাকে Komos বলা হতো। প্রথম দিকের কমেডিতে ভাঁড়ামি, লোকজনকে বাক্যবানে বিদ্রুপ করা, অশ্লীলতা ইত্যাদির আধিক্য দেখা যায়। তবে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জমির উর্বরতা অর্জন। এথেন্সে বসন্ত উৎসবে ট্রাজেডি অভিনয়ের রীতি খৃঃ পূঃ ষষ্ট শতাব্দি থেকে দেখা যায়, আর কমেডি অভিনয়ের সুযোগ লাভ করে ৪৮৬ খৃঃ পূর্বাব্দে। কমেডি সাধারণত শীত উৎসবে অভিনীত হতো। তবে উল্লেখিত শতকের শেষে শীত উৎসবেও ট্রাজেডি অভিনীত হতো।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এলিজাবেথান যুগের নাট্যকারেরা যতটা প্রভাবান্বিত হয়েছেন গ্রীক নাটক দ্বারা বা গ্রীক নাট্যকারদের দ্বারা, তার চেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছেন সেনেকার দ্বারা। সেনেকা রোমান নাট্যকার। সর্বকালের কুখ্যাত রোমান সম্রাট নেরোর গৃহ শিক্ষক ছিলেন এই সেনেকা। সেনেকা যখন নাট্যকার, তখন রোমান নাটকের ডিকাডেন্ট পীরিয়ড চলছিল।

এরিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সে ট্রাজেডির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং ট্রাজিক হিরোর যে স্বরূপ নির্ণয় করেছেন তা এলিজাবেথান যুগের ট্রাজেডির সাথে পুরোপুরি মিলে না। এরিস্টটলের মতে ট্রাজেডিতে কমিক দৃশ্য বা কমেডিতে ট্রাজিক দৃশ্য থাকা বাঞ্চনীয় নয়। কিন্তু এলিজাবেথের যুগের নাটকে আমরা এর মিশ্রণ দেখি। আসলে নাটক যদি জীবনের প্রতিরুপ হয় আর জীবন যদি সুখ-দুঃখের সমন্বয় হয়, তবে কেন তাতে ট্রাজিক ও কমিক দৃশ্যের মিশ্রণ থাকবে না। তবে ট্রাজেডিতে এত বেশী কমিক দৃশ্য থাকা চলবে না, যাতে সেটা ট্রাজিক এটমোস্ফীয়ারকে বিঘ্নিত না করে। আমরা শেক্সপীয়ারের নাটকে ট্রাজিক ও

কমিক দৃশ্যের এক অনবদ্য সমন্বয় দেখি। শেক্সপীয়ার এতই যত্ন সহকারে কমিক দৃশ্যকে ট্রাজেডিতে এনেছেন যে, আমরা মনে করি এমনটি ঠিক এই পরিস্থিতিতে থাকা মন্দ নয়। এবং এটা ট্রাজেডির গাম্ভীর্যও খর্ব করে না। এজন্যই হয়তো ড্রাইডেন বলেছেন যে, এরিস্টটল যদি শেক্সপীয়ারের নাটক দেখতেন তবে হয়তো ট্রাজেডির সংজ্ঞা অন্যভাবে দিতেন।

গ্রীক যুগের কমেডির ধারণা আধুনিক যুগের কমেডির ধারণার সাথে মিলে না। প্রাচীনকালে কমেডির উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে হাসানো। এজন্য কমেডিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাঁই পেত। কমেডিতে মানুষকে হেয় রূপে উপস্থাপিত করা হতো। কিন্তু আধুকি কালে কমেডির উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আনন্দ দেওয়া। হাসি আর আনন্দ এক জিনিস নয়। স্যার ফিলিপ সিড্নি হাসি আর আনন্দের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন তাঁর Apology For Poetry তে। একটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু হাসির উদ্রেক করে না। অন্য ক্ষেত্রে একজন পন্ডিত ব্যক্তির বোকামি হাসির উদ্রেক ঘটায়, কিন্তু আনন্দ দেয় না। বরং তাঁর জন্য মায়ার উদ্রেক ঘটে। শেক্সপীয়ারের কমেডি গুলো পড়ে আমরা মূলত: আনন্দ পাই। আমরা যদি হাসি তবে সেটি অতিরিক্ত পাওয়া হবে।

এখন আমরা আবার ফিরে তাকাব গ্রীক যুগের ট্রাজেডি ও কমেডির মঞ্চস্থ করার পার্থক্যের দিকে। প্রাচীন গ্রীক যুগে নাটক গুলো মঞ্চস্থ হতো সাধারণত পাহাড়ের উপত্যকায়। পাহাড়ের গা কেটে কেটে দর্শকদের বসার আসন তৈরি করা হতো। ট্রাজেডি নাটকে অভিনেতারা মুখোশ ছাড়াও বিশেষ পোষাক পড়ত। এই পোষাক ছিল জাকজমক পূর্ণ। ঈস্কিলাসের সময় চালু হয় লম্বা জোব্বা। মাথায় বিশেষ ধরনের বেনী করা হতো। একে Onkos বলা হতো। ট্রাজেডিতে অভিনেতারা এক ফুটেরও উচু জুতা পড়ত। কিন্তু কমেডিতে এসবের বালাই ছিলনা। ট্রাজেডি ভাব গম্ভীর নাটক আর তাই ট্রাজেডির অভিনেতারা সম্ভ্রম পূর্ণ।আর কমেডির অভিনেতারা ভাঁড়। ট্রাজেডির অভিনেতারা প্যাড পড়ত শরীরটাকে মোটা করে দেখানোর জন্য, যাতে দূর থেকে দর্শকরা দেখতে পান। কিন্তু কমেডিতে এসবের বালাই ছিল না। আসলে একটা কথা ভূলে গেলে চলবে না যে, প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে, ট্রাজেডি কেবলমাত্র গম্ভীর প্রকৃতির এরিস্টক্রাট্স (Aristocrates) দের জন্য এবং কমেডি হলো গ্রামীন লঘু মনের মানুষদের জন্য।

শেক্সপীয়ারের নাটকে অলৌকিকতা

একবার নাকি জুলিয়াস সীজার বলেছিলেন যে, " পৃথিবীতে আমি অনেক জাতি দেখেছি, কিন্তু ইংরেজ জাতির ন্যায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতি আমি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি দেখেনি।" আসলে এ কথাটি ইংরেজ সভ্যতার সাথে যদিও বেশ বেমানান কিন্তু এংলো স্যাক্সন যুগ থেকে এমনকি আজ পর্যন্ত যদি শুধু আমরা ইংরেজী সাহিত্যের পর্যালোচনা করি তবে দেখব যে এর কতটা বিশাল অংশ জুড়ে অলৌকিকতায় বিশ্বাস বিরাজমান। যদিও বৃটেন জুলিয়াস সীজার কর্তৃক বিজিত হয় ৫৫ খ্রী: পুর্বাব্দে, উপনিবেশিকতার প্রক্রিয়া তিনি পরবর্তী একশত বছরেও শূরু করতে পারেন নি। ষষ্ট শতাব্দীতে ব্রিটেনে আগমন ঘটে তিনটি দূর্ধর্ষ জাতির। এরা হলো এঙ্গলো, স্যাক্সন ও জুট বা গীট। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, গীটরাই কিন্তু ইংরেজী ভাষার প্রথম মহাকাব্য বিউল্ফ এর কাহিনী এদের স্বদেশ থেকে আমদানী করেছিলেন। যদিও বিউল্ফ রচিত হয় ৭৫০ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, এর রচয়িতার নাম আজও জানা যায়নি। তবে খুব সম্ভবত কোন ধর্মযাজক এটা লিখে থাকতে পারেন কারণ সে সময় কেবলমাত্র যাজকরাই লিখতে পড়তে জানত।এই মহাকাব্যের স্পিরিট হলো খ্রীষ্টান যদিও তা প্যাগান গল্পকে আশ্রয় করে পুষ্ট হয়েছে। বিউল্ফ সবচেয়ে সৌভাগ্যবান কবিতা, কারণ এর পান্ডুলিপি বেশ কয়েকবার আগুনের হাত থেকে বেঁচে যায়।

তো যাই হোক, বিউল্ফ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে অলৌকিকতার ছোঁয়া আমরা দেখতে পাই। শেক্সপীয়ার এর ব্যতিক্রম নন। শেক্সপীয়ার তাঁর বেশ কয়েকটি নাটকে (ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, টেমপেস্ট, জুলিয়াস সীজার ইত্যাদি) অত্যন্ত স্বতস্ফুর্তভাবে অলৌকিকতার ব্যবহার দেখিয়েছেন। আমরা শেক্সপীয়ার পূর্ব যুগের সাহিত্যে অলৌকিতার (Supernaturalism) ব্যবহার দেখি কিন্তু তা পরিশুদ্ধ বা রিফাইন্ড নয়। এগুলো ক্রুড। কিন্তু শেক্সপীয়ারের সুপারন্যাচারালিজম অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও রিফাইন্ড।

এখন দেখা যাক কেন শেক্সপীয়ার তাঁর নাটকে এই সুপারন্যাচারালিজমের ব্যবহার করেছেন। আসলে শেক্সপীয়ারের যুগে যদিও রেনেসাঁর হাওয়া ইংল্যান্ডে লেগেছিল তবুও শিক্ষিত-মূর্খ নির্বিশেষে সবাই অলৌকিকতায় বিশ্বাস করত। আমরা অবশ্যই মনে রাখব যে শেক্সপীয়ার কুইন

এলিজাবেথ (রাজত্বকাল ১৫৫৮ হতে ১৬০৩) ও প্রথম জেম্‌স (রাজত্বকাল ১৬০৩ হতে ১৬২৫) এই দু'জনেরই পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। এদের শাষনামলে প্রায় সকলেই অলৌকিকতায় বিশ্বাস করত। স্বয়ং রাজা জেম্‌সও ডাকিনিদের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপে বিশ্বাস করতেন। কাজেই শেক্‌সপীয়ার সেই যুগের দর্শকদের চাহিদা মেটাতে তাঁর নাটকে অতিলৌকিকতার ব্যবহার করেছেন। যদিও এলিজাবেথান পিরিয়ডে ইংল্যান্ডে রেনেসাঁসের হাওয়া বইছে তথাপি মানুষ অলৌকিকতায় বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। আমাদের জওহররাল নেহেরুর কথাটি মনে করলে্ বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। তিনি তাঁর মহান গ্রন্থ "দি ডিসকোভারি অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে বলেছিলেন যে, রেনেসাঁ যতটা না উদ্বুদ্ধ করেছিল বিজ্ঞানকে, তার চেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল দুঃসাহসিক অভিমানকে। কাজেই শেক্‌সপীয়ারের যুগে মানুষ এত বেশী বিজ্ঞানে আকৃষ্ট ছিল না যে তারা অলৌকিকতার ভূতকে ইংল্যান্ডের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিতে পেরেছিল। এছাড়া মানব মন সহজেই অলৌকিকতার পানে ছুটে ছুটে যায়। অতীতের সেই রূপকথার গল্পগুলো এ কথারই প্রতিফলন মাত্র। শুধু কি ইংরেজি সাহিত্যে আমরা অলৌকিকতা পাই ? তা নয়। আসলে প্রথিবীর সকল সাহিত্যেই এই অলৌকিকতার এক বিরাট রাজত্ব। ইংরেজরা ইংরেজ, কিন্তু মানুষ। আর অলৌকিকতায় বিশ্বাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই শেক্‌সপীয়ারের সমসাময়িক দর্শক নাটকে অলৌকিক ভূত, অপচ্ছায়া, ডাকিনি ইত্যাদি দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। আর শেক্‌সপীয়ার যেহেতু সূক্ষ জীবন দ্রষ্টা, কাজেই কিভাবে তিনি তাঁর দর্শকদের নিরাশ করবেন। ডক্টর স্যামুয়েল জনসন তাঁর "প্রিফেস টু শেক্‌সপীয়ার" এ বলেছেন যে, শেক্‌সপীয়ারের নাটক বাস্তব জীবনের নির্ভরযোগ্য আয়না স্বরূপ। যদি তাই হয় তবে কেন তাঁর নাটকে তিনি তাঁর সমমাময়িক দর্শকদের রুচির প্রতিফলন ঘটাবেন না। এ-তো হতে পারে না। তিনি যে তাঁর যুগের কবি, সর্বযুগের কবি। এ সম্বন্ধে আমরা তাঁর বন্ধু বেন জনসনের উক্তিটি উল্লেখ না করলে একটা অতৃপ্তি রয়ে যাবে। জনসন একবার বলেছিলেন যে, শেক্‌সপীয়ার শুধু তার যুগের নয়, সর্বকালের সর্বযুগের কবি।

শেক্‌সপীয়ারের নাটকের অলৌকিকতার তাৎপর্য একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শেক্‌সপীয়ার যে শুধু তাঁর দর্শকদের তুষ্ট করার জন্যেই অলৌকিকতাকে তাঁর নাটকে ঠাঁই দিতেন তা নয়। এর পিছনে ছিল বিরাট সূদূর প্রসারী এক মনস্তাত্ত্বিক কারণ। আর তা হলো তাঁর চরিত্র গুলোর সাইকোলোজিক্যাল ব্যাখ্যা। এই কথাটা পরিষ্কার হবে যদি আর একটু ব্যাখ্যা করি। আমরা ম্যাকবেথ নাটকে কতিপয় সুপার ন্যাচারাল উপাদান দেখি, যেমনঃ

ডাকিনি, ড্যাগার, ব্যাঙ্কোর ভূত, এবং আরও কিছু অপচ্ছায়া যা ম্যাকবেথকে সতর্ক করেছিল এবং তাকে আরও বেশী রক্ত পিপাসু হতেও উৎসাহিত করেছিল। আসলে এই অতি প্রাকৃত উপাদান গুলো ম্যাকবেথের চরিত্রের এক একটি দিক অংকন করে। ডাকিনিরা ম্যাকবেথের অপ্রতিরোধ্য উচ্চাকাঙ্খার প্রতিরূপ। এ কথাটা বুঝতে হলে একটু সতর্কতার সাথে নাটকটির প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্য পাঠ করলেই হয়। এখানে দেখি, ম্যাকবেথ অপর সহকারী জেনারেল ব্যাঙ্কোকে সাথে করে যুদ্ধ জয় করে ফিরছে। পথিমধ্যে সে তিন ডাকিনির সাক্ষাৎ পায়। এরা ম্যাকবেথকে যথাক্রমে গ্লামিস ও কডরের অধিপাত এবং স্কটল্যান্ডের রাজা বলে সম্বোধন করে। যদিও ম্যাকবেথ প্রথমে দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে তথাপি অল্প পড়েই সে যখন জানতে পারে যে, সে কডরের অধিপতি নির্বাচিত হয়েছে তখন সে বিশ্বাস না করে পারে না ডাকিনিদের। তাঁর উচ্চাকাঙ্খা গেল আরও বেড়ে। লক্ষণীয় যে, ম্যাকবেথ কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার আগে ডাকিনিদের সাক্ষাৎ পায় নি। সে ডাকিনিদের দেখা পায় যুদ্ধ জয় করে ফেরার পথে। আমরা জানি যে, একের পর এক সাফল্য মানুষকে উচ্চাভিলাসী বানাতে পারে সহজেই। যে ম্যাকবেথ রাজা ডানকানের সেনাবাহিনীর নিউক্লিয়াস স্বরূপ ; যাকে বেলোনার (যুদ্ধ দেবী) বর বলা হয়, তাঁর মনে যুদ্ধ জয়ের পর রাজা হওয়ার বাসনা জাগতেই পারে। তাই সে যুদ্ধ জয় করে ফেরার পথে ডাকিনিদের দেখা পায়, যা তাঁর উচ্চাকাঙ্খার প্রতিফলন মাত্র।

ডানকানকে হত্যা করার প্রাক্কালে ম্যাকবেথ পায়চারী করছে অস্থির মস্তিষ্কে। তাঁর মস্তিষ্কের হত্যাকান্ড সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার ঘনীভবনকে শেক্‌সপীয়ার অংকন করেছেন ড্যাগার এর মধ্য দিয়ে। ব্যাঙ্কোর ভূত শুধুমাত্র ম্যাকবেথের খুন খারাপি সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনারই প্রতিফলন মাত্র। আর তাই তো স্বয়ং লেডি ম্যাকবেথও এ পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। 'হ্যামলেট' নাটকে হ্যামলেট তার পিতার যে ভূত দেখে তা হয়ত তার মনের গভীরে প্রোথিত সন্দেহ যে তার বাবাকে সাপে কাটেনি বরং খুন করা হয়েছে - এরই প্রতিফলন। রাজা হ্যামলেটের ভূতকে রাণী গারট্রুড দেখতে পায় না কারণ সে তার হত্যাকারী ক্লোডিয়াসকে বিয়ে করে বিয়ের পবিত্র বন্ধনকে অপবিত্র করেছেন। 'টেমপেস্ট' নাটকের এরিয়েল এর ম্যান লাইক একটিভিটিজ নাটকের পরিবেশ সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ক্যালিবানের চরিত্রের মধ্য দিয়ে শেক্‌সপীয়ার অংকণ করেছেন মানব চরিত্রের অন্ধকার দিকগুলো যেমন - মাংস লোলপতা, প্রতিহিংসা, লোভ ইত্যাদি। 'ম্যাকবেথ' নাটকের শুরুতে ডাকিনিরা যে উক্তিটি করে "ভালই মন্দ, মন্দই ভাল" তা সমগ্র

নাটকে আবহ সৃষ্টিতে তাৎপর্য পূর্ণ ভূমিকা রাখে। 'হ্যামলেট' নাটকে রাজা হ্যামলেটের ভূত রিভেন্জ মোটিভ তৈরীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আসলে শেক্সপীয়ার একজন জাত শিল্পী। তাঁর চরিত্র সৃষ্টি অতুলনীয়। যদিও শেক্সপীয়ার তাঁর একাধিক নাটকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বা উপাদানের অবতারণা করেছেন, তবুও কোনটার সাথে কোনটা বা একটার সাথে আর একটা মিশে যায় না। অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলো স্বতন্ত্র। যদিও আমরা বললাম যে, ডাকিনিরা ম্যাকবেথের উচ্চাকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি, রাজা হ্যামলেটের ভূত হ্যামলেটের সন্দেহের প্রতিফলন তথাপি আমরা যদি সতর্কতার সাথে এসব কিছুই চিন্তা না করে নাটকগুলো পড়ি বা দেখি তবে কি তারা নাটকের কোন ক্ষতি করে। না। নিঃসন্দেহে না। কারণ তারা এক একটা স্বতন্ত্র চরিত্র। তাদেরকে পাপেট মনে হয় না। তারা রক্ত মাংসের তৈরি। এ যুক্তিটা খন্ডন করতে আর একটা কথা না বললেই না। ডাকিনিরা যদি ম্যাকবথের মনের উচ্চাকাঙ্খার প্রতিচ্ছবিই হয় তবে কেন তা ব্যাঙ্কোও অবলোকন করল ? হ্যামলেটের ভূত যদি নায়ক হ্যামলেটের সন্দেহের বহি প্রকাশ হয তবে কেন তা তার বন্ধু হোরাশিও ও প্রহরীরাও অবলোকন করল ? এসব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা দেখি যে, এসব অতিপ্রাকৃত উপাদানের নিজস্ব স্বকীয়তা আছে। এর আরও বিশদ ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের এদের মন্ময় ও তন্ময় (Subjective & Objective) দিকগুলোও আলোচনায় আনতে হবে। কিন্তু তার পরও কি শেক্সপীয়ারের মত এক মহান শিল্পীর শিল্প কৌশল সম্পর্কে এতটুকুও জানা সম্ভব হবে ?

এখন আর একটা কথা না বললেই না আর তা হলো কেন আজকের এই বিজ্ঞানের বিশাল বিকাশের দিনেও আমরা শেক্সপীয়ারের অতিপ্রাকৃত ঘটনা বা উপাদানগুলোকে উপভোগ করি। কেন আমরা আজও এগুলোকে আনন্দের উৎস মনে করি। কেনই বা এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা এক ইউনিভার্সাল এপিল পেয়েছে। উত্তরটা হলো আমরা যদিও বিজ্ঞানের চরম শীর্ষে অবস্থান করছি। প্রকৃতির অনেক রহস্যের উদঘাটন করেছি। কিন্তু আমাদের সবার মনের গহীনে অলৌকিতার একটা বীজ রপ্ত আছে। বিজ্ঞান বলে দিয়েছে যে মরা মানুষ ভূত হয় না। তাই বলে কি আমি অন্ধকার, নির্জন লাশ কাটা ঘরে একটা বীভৎস পঁচা গলা লাশ পাহারা দিতে রাজি হব ? হয়ত না। কারণ অলৌকিকতার প্রতি মনের গভীরে লুক্কায়িত বিশ্বাস। আর একটা উদাহরণ না দিলেই নয় আর তা হলো বেশ কিছুদিন আগে বি.টি.ভি.তে 'আলিফ লায়লা' নামে একটি ধারাবাহিক সিরিজ প্রচারিত হয়েছিল। বি.টি.ভি.র কোন অনুষ্ঠানই এ যাবৎ কালে এর মত

জনপ্রিয় হয়নি। এক জরীপে দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৫ ভাগ দর্শক এই সিরিজটি উপভোগ করে। এটাই কি প্রমাণ করে না যে, আজও মানুষ অতিপ্রাকৃত ঘটনা উপভোগ করতে ভালবাসে নোভেলে, নাটকে।

কবি ও কাব্য

এলিজাবেথান পিরিয়ডের প্রখ্যাত কবি ও ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচনার পথিকৃৎ স্যার ফিলিপ সিড্‌নি বলেছেন যে, কবিতা হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম একটি মাধ্যম যা মূর্খকে জ্ঞান দান করেছিল। আসলে সিড্‌নি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। কবিতা কি, তা যদি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা যায় তবে এ কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেওয়া যায়। আসলে গদ্য হলো রিসেন্ট একটি শাখা যা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে পদ্য বা কবিতা সৃষ্টির অনেক অনেক পরে। পক্ষান্তরে, সাধারণভাবেই গদ্য যা বলে তা-ই বুঝায়। কিন্তু পদ্য যা বলে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী বুঝায়। একথা প্রমাণ করতে শুধু ইলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' কবিতা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলেই হয়। এ কবিতার ৬২ হতে ৬৫ লাইনের মধ্যে ইলিয়ট রন্ডন ব্রীজের উপর দিয়ে চলমান কিছু পথিকের চলন ভঙ্গির যে বর্ণনা দিয়েছেন, যে সবাই শুধু দৃষ্টি নিজেদের পায়ের প্রতি নিবদ্ধ রেখে পথ চলছে - ইহা নিঃসন্দেহে মডার্ণ এজের মানুষদের আত্মকেন্দ্রিকতা ফুঁটে তুলেছে। মডার্ণ এজ যে, ক্রাইসিসের যুগ তা গদ্যে বর্ণনা করতে অনেক কথাই বলতে হতো ইলিয়টকে। কিন্তু তিনি তাঁর উল্লেখিত কবিতার মাত্র চার লাইনের মধ্য দিয়ে যে ইমেজ অংকণ করেছেন তা নির্দিধায় সারগর্ভ ও বাখ্যার যোগ্য। আসলে এটাইতো কবিতা। কবিতা তো এমনই হওয়া উচিত।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন কালের জাঁদরেল ব্যক্তিদের সবাই প্রায় কবি ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের ইন্টেলেকচুয়াল জায়ান্ট হলেন হোমার, মোসেউস ও হেসিয়ড। এদের সবাই ছিলেন কবি। প্রাচীন কালের সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের বই পুস্তক লেখা হতো কবিতার ঢঙ্গে কারণ তা সহজেই মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করত। তাই বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিকগণও এর লোভ সামলাতে পারেন নি। প্লেটো নাকি তাঁর দর্শন চিন্তা কবিতার ঢঙ্গেই প্রকাশ করেছিলেন। প্রাচীন রোমের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যেমন -দান্তে, বোকাসিও ও পেট্রাক - এরা কবিতার সাহায্যেই তাঁদের বিজ্ঞান চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন এবং আজ এঁরা কবি হিসেবে সুবিদিত। ইংরেজ কবি গাওয়ার ও চসারের মাধ্যমেই ইংরেজগণ তাঁদের মাতৃভাষার প্রথম স্বাদ পেয়েছিল। প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত কবিতার মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন তাঁদের ইতিহাস বিষয়ক লেখার জন্য। এ বিয়য়ে স্যার ফিলিপ সিড্‌নি বলেছেন যে, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক কেহই জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পেত না যদি না তাঁরা কবিতার কাছ থেকে পাসপোর্ট নিত। অর্থ্যাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, কবিতা হলো জ্ঞানের রাজ্যের প্রবেশ দ্বার।

কবিগণ প্রাচীন কালে কেমন ভাবে মানুষদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তা একটু ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিলেই হয়। প্রাচীন রোমানগণ কবিদেরকে ভেট্‌স বা ডিভাইনার বলতেন। তাঁদের মতে কবিগণ কোন সাধারণ মানুষ নয়, এঁরা খোদা প্রেরীত মহাপুরুষ। গ্রীকরা কবিদেরকে পোয়েট বলতেন যার অর্থ হলো মেকার। কিসের মেকার তাঁরা ? কবিরা হলেন একটা গোল্ডেন ইউনিভার্স তৈরীর মেকার। খোদার তৈরী পৃথিবী ব্রোঞ্জের তৈরী, অপর পক্ষে কবির তৈরী পৃথিবী সোনার তৈরী। খোদার তৈরী পৃথিবীতে রূক্ষ বাস্তবতা প্রতি পদে পদে মানুষকে করে ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু কবির তৈরী বিশ্বে আছে শুধু আইডিয়াল বিউটি বা নির্ভেজাল আনন্দ। কবিতার নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে যা শিক্ষিত, মূর্খ নির্বিশেষে সবাইকে মুগ্ধ করে। বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞান শিক্ষিত ব্যক্তিকেই আনন্দ দেয়। আর কবিতা সবাইকে আনন্দ দেয়। তাই হয়তো রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিকে স্থান দিয়েছেন বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকের উপর। এরিস্টটল আলেকজান্ডারকে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার এক পর্যায়ে যখন তিনি তাঁকে হোমার পড়াতে শুরু করলেন তখন আলেকজান্ডার সব ছেড়ে কবিতার প্রতি ঝুকে পড়লেন এবং উৎসাহ পেলেন দিক বিজয়ী বীর হওয়ার।

এখন আসা যা'ক অন্য একটি বিষয়ে। যে কেউ ইচ্ছা করলেই কি কবিতা লিখতে পারে ? না। কবিতা লেখার জন্য কবি সত্ত্বার প্রয়োজন হয়। যদি তাই না হত তবে চসারের পর একজন সত্যিকারের সৃজনশীল কবির জন্য ইংল্যান্ডকে একশত সত্তর বছর অপেক্ষা করতে হত না। আর একশত সত্তর বছর পর যে কবি কবিদের কবি হিসেবে জন্ম নিয়েছিলেন তিনি হলেন এডমান্ড স্পেন্সার। তিনিই সর্বপ্রথম কবিতায় কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যা পরবর্তী কালের কবিদের কাছে আদর্শ হিসেব কাজ করেছে। হ্যাঁ, একটা কথা আমরা বলেই ফেলেছি যে, কবি হিসেবে যার জন্ম সেই কবি হয়। আর একটু পরিষ্কার করে বলার জন্য জন মিলটনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে, বলতে হয় যে, কবির জন্ম হয়, কবি তৈরী হয় না। স্কুল পালালেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না। একজন সৃজনশীল কবির কবিতা সুরা স্বরূপ যা মানুষকে মাতাল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। অন্যক্ষেত্রে একজন মেকি কবির কবিতা পানির মত যার ইনটক্সিকেটিং ক্ষমতা নেই। এই কথাটি অবশ্য আমার নয়, হোগার্থের যিনি 'এস্থোলজি অব প্রোজ' বইটার স্বনামধন্য লেখক। একজন লোক ছন্দবদ্ধ কিছু কথা লিখেছেন মধুর মধুর কিছু শব্দকে পাশাপাশি সাজিয়ে। তিনি একজন ভার্সিফায়ার হতে পারেন, কবি নন। তিনি তখনই কবি হবেন যখন এর সাথে

যোগ হবে এমন এক ভাবনার যা সবার হৃদয়কে স্পন্দিত করে। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটি বুঝানো যায়। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্য শব্দ চয়ন, ছন্দ, সুরের ঝংকার ইত্যাদি দ্বারা অলংকৃত। তার চেয়েও বড় কথা হল এতে যোগ হয়েছে মানব জীবন সম্পকিত বিশ্ব চিরন্তন একটা ভাব। এই ভাবই একে কবিতার আসনে বসিয়েছে।

আজকের দিনে আমরা হা-হুতাশ করি যে কেন রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের মত কবি তৈরী হচ্ছে না। আসলেই হচ্ছে না এই জন্য যে, আমরা বই পুস্তক থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। কবিতা কি, বুঝিনা। কবিতার মর্ম উপলব্ধি করতে সময় ব্যয় করি না। লিখতে শুরু করেই বিখ্যাত হওয়ার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ি। সমালোচনার স্বীকার হলেই প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে উঠি। তাহলে কি রবীনাদ্রনাথ হওয়া যায় ? ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সৃজনশীল লেখক তৈরীর জন্য সৃজনশীল সমালোচকও দরকার।

সাহিত্যিক, তাঁর দেশ ও সমাজ

কোন সত্যিকারের লেখকই তাঁর পরিবেশ, সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, রাজনৈতিক পটভূমি ও তাঁর সময়ের জ্ঞান চর্চার ধারার প্রভাব এড়াতে পারে না। প্রত্যেক লেখকই তাঁর নিজের যুগের ও সমাজের প্রোডাক্ট মাত্র। একটি যুগের আবহাওয়া সে যুগের লেখকের চিন্তা-চেতনার খোঁড়াক যোগায়। লেখকের লেখা তাঁর যুগকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরে। আর এজন্যই তাঁর চিন্তা-চেতনা সুষ্ঠভাবে উপলব্ধি করতে তাঁর যুগের একটা স্টাডি দরকার হয়। এই কথাটি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চাইতে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। একটা উপন্যাস একটা যুগের আয়না স্বরূপ। হেনরী ফিল্ডিং যাকে উপন্যাসের জনক বলা হয়, তাঁর 'টম জোন্স' উপন্যাসটি অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি পেনোরামা স্বরূপ।

একটা যুগের ভাষা সে যুগের শিল্প ও সহিত্যকে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবান্বিত করে। ১০৬৬ সালে যখন নরম্যানরা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যান্ডে এসে তৎকালিন রাজা হ্যারোল্ডকে পরাজিত ও নিহত করে ইংল্যান্ড দখল করে। তারপর ইংল্যান্ডের জনগণ যারা এংলো-স্যাক্সন ভাষায় কথা বলত তাদের মধ্যকার যারা শাসক গোষ্ঠী বা অ্যারিস্টক্র্যাট ছিল তারা ফরাসী ভাষা শেখা শুরু করে দেয়। নরম্যানরাও চার্চ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ফরাসী ভাষা শেখানোর উপর জোর দেয় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্যে। কালক্রমে দেখা গেল ফরাসী ভাষা ইংল্যান্ডের ইংরেজী ভাষাভাষি মানুষের ভাষায় পরিণত হলো। এই ফরাসী বা নরম্যান ভাষা ইংরেজী ভাষার সাথে এমন ভাবে মিশে গেল যে আজ ফরাসী ভাষার অনেক শব্দই ইংরেজী ভাষায় স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন ধরুন 'লিবার্টি' শব্দটি নরম্যান ভাষার শব্দ যা ইংরেজী ভাষায় অহরহ ব্যবহৃত হয়। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ অবশ্য ফ্রিডম। আমরা অনেকেই জানিনা যে, চ্যারিটি, ফ্র্যাটারনিটি, বোন্ড ইত্যাদি নরম্যান ভাষার শব্দ।

নরম্যান ভাষা ইংরেজী সাহিত্যকে কতটা ঋণী করেছে তা নির্ণয় করতে চসারের কাছে যেতে হবে। চসারের প্রথম যুগের রচনা ফরাসী রোমান্টিক কাব্যের অনুকরণে রচিত। জীবনের অনেকগুলি বছর তিনি অতিবাহিত করেছেন ফরাসীতে। সেখানে প্রথম জীবনে শিক্ষালাভ করেছেন। ফরাসী সাহিত্যিক ও কবিদের কাছ থেকে সাহিত্য রচনার হাতে খড়ি তিনি লাভ করেছেন। চসারের ফরাসী ভাষার ছিল অসাধারণ দখল। ফরাসী ভাষা এত সুন্দর ভাবে দখল

করেছিলেন যে, চসার স্বতস্ফূর্তভাবে এই ভাষায় কথা বলে যেতে পারতেন। ফরাসী কাব্যের ছন্দ বৈচিত্র্য তাঁকে ও তাঁর কবি স্বত্তাকে আলিঙ্গন করেছিল গভীরভাবে। রোমান্টিসিজমের কল্পনার জগৎ চসারকে হাতছানি দিয়ে বার বার ডাকলেও তিনি বাস্তবকে এড়াতে পারেন নি। যদিও চসারকে হাডসন পোয়েট অব ম্যান বলেন না, তথাপিও তিনি কমবেশী মানুষেরই কবি। তার সমসাময়িক কৃষক বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে তাঁর 'নান্স প্রিষ্ট্স টেলস'এ। ইতালিতে যে রেনেসাঁর বীজ বপিত হয় তা চসারকে প্রভাবান্বিত অবশ্যই করেছিল গভীর ভাবে। তিনি কল্পনার আকাশ থেকে বাস্তবের মাটিতে•পা রেখেছিলেন।

চসারের পর একজন সৃজনশীল প্রতিভাবান কবি পেতে ইংল্যান্ডকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল একশত সত্তর বছর। এই দীর্ঘ সময় পরে ইংরেজী সাহিত্যের আকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়েছিল সে আর কেউ নয় - এডমান্ড স্পেন্সার যাকে কবিদের কবি বলা হয়। চসার ও স্পেন্সারের মধ্যকার যে বিরাট একটা শূন্যতা তা যে একেবারেই ফাকা ছিল তা নয়। স্যার টমাস মেলরী অবশ্য ১৪৭০ সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্য মরটি ডি আর্থার লিখেছিলেন। এ কাব্যটি ক্যাক্সটন কর্তৃক প্রকাশিত ও ছাপা হয়। এতে ঐতিহাসিক চরিত্র আর্থারের গাঁথা তৈরী করা হয়েছে।

শেক্সপীয়রের নাটকে উইলিয়াম কংগ্রীভ যেমন সমাজ চিত্র অংকণ করেছেন তেমন সমাজ চিত্র ফুটে উঠেনি। তবে আমরা কখনই ভুলে যাইনা যে শেক্সপীয়র তাঁর নাটকে কোন নির্দিষ্ট দেশের বা কালের মানুষের বা সমাজের চিত্র অংকণ করেন নি। তিনি যে কাল, যে দেশ, যে সমাজর ছবি অংকণ করেছেন তা সার্বজনীন ও সর্বকালীন। 'ফেইথফুল মিরর অব ম্যানার এন্ড লাইফ' বলতে আমরা যা বুঝি তা শেক্সপীয়ারের নাটকেই পাওয়া যায়।

একজন সংবেদনশীল লেখক কখনও তাঁর সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারেন না। সমাজের অসংগতি ও দুষ্টক্ষত গুলো তার চোখে পড়বেই এবং তিনি নিরপেক্ষভাবে ও সুস্পষ্টভাবে তা শিল্পীর রংতুলি দিয়ে অংকণ করে তুলে ধরবেন তা পাঠকের চোখের সামনে। চাটুকারিতা ও খোসামোদ সত্যিকারের সাহিত্যিককে স্পর্শ করতে পারে না। যেমন পারেনি জন মিলটনকে। জন মিলটন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন শাসক ও শোষক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার প্যারাডাইজ লস্টে । তাইতো স্যাটান বলে যে স্বর্গে দাসত্ব করার চাইতে নরকে রাজত্ব করা ভাল। সে গডের রাজত্ব মানবে না কারণ সে চায় স্বাধীন জীবন যা গড দিতে নারাজ। আসলে স্যাটানের স্পিরিট

গণতন্ত্রকামী জন মিলটনের স্পিরিটই বটে। উইলিয়াম কনগ্রীভ তৎকালীন নোংরা ও বিকৃত রুচীর অভিজাত পরিবারের নারী পুরুষদের ন্যাক্কার জনক চালচলন ও আচার ব্যবহার অংকণ করতে দ্বিধা করেন নি। তিনি তাঁর বিখ্যাত কমেডি 'দি ওয়ে অব দি ওয়ার্লড' নাটকে বিয়ে ও অর্থের যে সম্পর্কের কথা আলোচনা করেছেন তা রেস্টোরেশন পিরিয়ডের অভিজাত মানুষদের জীবন যাপন প্রণালীর ধিক্কার জনক সাবলীল ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যকরা এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। শরৎচন্দ্রের কথাই যদি শুধু বলি তবে দেখব তাঁর লেখায় তিনি কিভাবে হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমির চিত্র এঁকেছেন।

রাজনৈতিক পাপ, সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন, রুচির বিকৃতি ইত্যাদি সাহিত্যিককে আকর্ষণ করে কলম ধরতে। ইংরেজ সাহিত্যিক জোনাথান সুইফট তাঁর গ্যালিভারস ট্রাভেল্স বইয়ে রূপকের মাধ্যমে যে চিত্র অংকণ করেছেন তা চিরকাল স্মার্তব্য। এই নভেলের প্রথম বইয়ে তিনি অংকণ করেছেন তৎকালীন রাজার (১ম জর্জ) নষ্ট নীতি, রবার্ট ওয়ালপোলের একচ্ছত্র দূর্নীতি ইত্যাদির কথা। দ্বিতীয় বইয়ে অংকিত হয়েছে রাষ্ট্র নায়কদের একরোখা নীতি, অস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগীতা, ক্ষমতার জন্য নিজের স্ত্রী-কন্যাকে অন্যের কাছে রাত কাটাতে পাঠিয়ে দেয়া ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ যা তৎকালীন ইংরেজ সমাজে সংক্রামক রোগের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বইয়ে বিজ্ঞানের অপচর্চা, মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে কিভাবে হত্যা করা যায় ইত্যাদি অংকণ করা হয়েছে। যে বিজ্ঞান মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় তা কখনই মানব জাতির কল্যাণে আসে না। আকাশে কতগুলি নক্ষত্র আছে তা জানার জন্য অযথা সময় ও অর্থ ব্যয় না করে কিভাবে ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেয়া যায়, কিভাবে রোগীকে রোগমুক্ত করা যায় এই চেষ্টাই সবার করা উচিত। জোনাথান সুইফ্ট এই সত্যটিই উপলব্ধি করেছিলেন যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এই অমর গ্রন্থে।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা তৎকালীন অনেক কবি সাহিত্যিককেই প্রভাবান্বিত করেছিল। ইংরেজ কবি শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন প্রমূখ তাঁদের লেখায় তুলে ধরেছেন সে কথা। চার্লস ডিকেন্স ফরাসী বিপ্লবের পরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল রবসপীয়রের দ্বারা তার দুঃখ জনক ছবি অংকণ করতে ভুলেন নি "এ টেল অব টু সিটিজ" এ। বর্তমান সমস্যা ও হট্টগোলের যুগের কবিরাও পিছিয়ে নেই এ ব্যাপারে। এখন আর কবি

সাহিত্যিকরা সেক্স, অর্থ ও এতদ সম্পর্কিত সমস্যা নিয়েই লেখেন না বরং তাঁরা এখন কিভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা ও বিনোদনের সাথে সম্পর্কিত আলাপ আলোচনাকে সাহিত্যে আনা যায় তাঁর ও সার্থক চেষ্টা করেছেন ও করছেন।

উপন্যাস, তার অঙ্গসংস্থান ও প্রকৃতি

ফরাসী পন্ডিত M. Abel Chevalley উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "It is a fiction in prose of a certain extent." অর্থ্যাৎ উপন্যাস হলো একটা গদ্যাকারে লেখা গল্প যার একটা বিশেষ আয়তন আছে। এখন এই আয়তন বা extent কতটুকু হবে তা ব্যাখ্যা করতে E. M. Foster সাহেব বলেছেন যে, উপন্যাস অবশ্যই পঞ্চাশ হাজার শব্দের নিচে লেখা হলে চলবে না। তবে Dr. Tilliard নভেল বা উপন্যাসের যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা কিন্তু মোটামুটি নড়বড়ে বলা চলে। তাঁর মতে "a novel is not too unorganised, fictious narrative in prose of at least, say, 20,000 words." তিনি হয়ত বা ভাবেন নি যে উপন্যাসের সংজ্ঞা আর একটু পর্যবেক্ষণ দাবি করে। তিনি আরও বলেছেন যে, "novel is not a literary kind of action, a minimum of length, and a minimum of organisation." যা হোক উপন্যাসের সংজ্ঞা আমরা সাধারণভাবে দিতে পারি যে, উপন্যাস একটি বাস্তব চিত্রে সমৃদ্ধ গল্প যার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো মানুষের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা। তবে উল্লেখিত সংজ্ঞা গুলোর কোনটাকেই পুর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হিসেবে দাবি করে ধৃষ্টতা দেখানোর চেষ্টা না করাই শ্রেয়।

উপন্যাস সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা। কিন্তু এর জন্ম হুট করে রাতারাতি হয়নি। যদিও উপন্যাস শব্দের ইংরেজী শব্দ Novel যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো অভিনব বা নতুন। ইংরেজী সাহিত্যে Novel একটি তুলনামূলক ভাবে নতুন সৃষ্টি হলেও এর সূত্রপাত ইংরেজী সাহিত্যের জনক চসারই ঘটিয়েছিলেন তাঁর Troilus and Creseidy কবিতার মধ্য দিয়ে। যদিও চসার নভেলের কোন ধারণাই তবুও এই কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি একটি গল্প বলার পদ্ধতির ধারণা দেন। চসারেরর পর ইংরেজী সাহিত্যের বলতে গেলে মরা কটাল চলে প্রায় একশত সত্তর বছর। এই দীর্ঘ সময় পর স্পেন্সার যদিও ইংরেজী সাহিত্যকে পুষ্ট করলেন তথাপি তিনি উপন্যাসের খোঁজ দিতে পারেননি। এলিজাবেথান পিরিয়ডের অপর লেখক টমাস ন্যাশ তাঁর The Life of Jack Wilton বা Unfortunate Travellers বইয়ের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম Picaresque Novel এর সূচনা করেন। আসলে এখানে Picaresque শব্দটিকে ব্যাখ্যা না করলেই নয়। Picaro শব্দটি Spanish যার অর্থ হলো Rogue বা

Knave. যে উপন্যাসের হিরো সাধারণত লম্পট ধরনের তাই Picaresque Novel. এক্ষেত্রে Picaresque Novel কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করলে ভুল হবে না। A Picaresque novel is a tale of the adventures and misadventures of a picaro or rogue who wonders from one countryto another, from one setting to another, from two to country, from one inn to another, and in this way the novelists gets an opportunity of introducing a variety of characters and incidents, of painting society as a whole realistically. মনে রাখা আবশ্যক যে Picaresque নভেলের উদ্দেশ্য বিদ্রুপ বা ঠাট্টা করা নয়। লেখকের উদ্ধেশ্য সমাজকে পূণর্গঠন করাও নয়, বরং পাঠকের চিত্ত বিনোদনের মধ্যেই এর চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্য নিহিত। তবে শিশু যদি চিনির প্রলেপযুক্ত তিক্ত ঔষধ মনে করে গিলে ফেলে ঔষধ কিন্তু চকলেট হয়ে যায় না। এর কার্যকলাপ শরীরের ভিতরে ঠিকই চলতে থাকে। আমরা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করে থাকি যে, প্রত্যেক সাহিত্যিকের পবিত্র কর্তব্য হলো to make the world better. তবে রসবিহীন উপদেশ প্রায় সবার কাছেই বিরক্তিরই নামান্তর। কাজেই একজন ভাল লেখকের প্রথম কাজ আনন্দের পসরা বিছানো। তিনি যদি কিছু শেখাতে চান তবে তাঁকে আনন্দের মধ্য দিয়েই শেখাতে হবে। রস ও চিন্তার সঠিক সমন্বয়ই সদা সজীব সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বশর্ত।

টমাস ন্যাশের The Life of Jack Wilton উপন্যাসটি Jack Wilton এর এডভ্যাঞ্চারের বর্ণনা দিয়েছে সাবলীল ভাবে। জ্যাক উইলটন যে কিনা অষ্টম হেনরির চাকর সে ফ্রান্স, জার্মানী, ফ্লান্ডার্স ও ইটালি ভ্রমণ করে। উপন্যাসের যে দৃশ্যাবলী ইটালিতে অনুষ্ঠিত হয় তাতে ইটালির শিল্প ও জৌলুসের সাবলিল বর্ণনা পাওয়া যায়। ইটালির কলুষিত চরিত্রের অভিজাত মহিলা-পুরুষ ও খুনী-বদমাশদের চরিত্র অংকণে আমরা অবশ্য কোন ত্রুটি দেখিনা। ন্যাশ এই উপন্যাসটিতে যেমন ইটালির শিল্প-সংস্কৃতির মন মুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি ইটালিকে অংকণ করেছেন এক বিভীষিকাময় ভূমি হিসেবে যেখানে চলে খুন, দূর্নীতি আর ভয়-ভীতির চর্চা।

টমাস ন্যাশের সম্ভবত রিচার্ড হুড ছাড়া আর কোন শিষ্য ছিল না। The English Rogue টমাস হুডের উল্লেখযোগ্য Picaresque উপন্যাস। যাই হোক অতপর যিনি Picaresque উপন্যাসের ধারাকে অব্যাহত রেখে চর্চা চালিয়ে যান তিনি হলেন Daniel Defoe. তার উপন্যাস গুলো formless এবং এগুলোতে আমরা কোন হতচ্ছাড়া বা লম্পট ব্যক্তির অভিযান-দূরাভিযান সম্বন্ধে

অবগত হই। এরা বিভিন্ন সমাজ ও দেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর অভিজ্ঞতার ঝুলি করে পরিপূর্ণ। মাঝখান থেকে লেখক পেয়ে যান তাঁর আলোচ্য বিষয়ের উপজীব্য। উল্লেখ না করলেই নয় যে Defoe Picaresque Novel এর ক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন হিরোর পাশাপাশি হিরোইনের অভিযান ও দূরাভিযানের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে। Defoe এর Moll Flanders নিঃমন্দেহে Picaresque Tradition এর ভিত্তি করে রচিত যদিও এটা পুরোপুরি Picaresque নভেল নয়। Defoe তার দুশ্চরিত্র রমণী, জলদস্যু, ডাকু, মাস্তান বা দুস্কৃতিকারীকে এমনভাবে দেখিয়েছেন যে, এরা হলো পরিবেশরই সৃষ্টি ও পরিস্থিতির স্বীকার এবং এই রকম পরিস্থিতিতে যে কেউ এমন হতে পারে।

Smollett এর নভেল গুলোর সবগুলোই Picaresque Tradition এর আওতায় পড়ে। তাঁর নভেল গুলো Picaresque নভেল হিসেবেই বেশী পড়া হয়।উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনি Le Song এর Gill Blas এর দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। Picaresque নভেল ষড়যন্ত্র (intrigue) ও অভিযান (Adventure) এর সমন্বয়ে গঠিত এবং মূলত প্রধান চরিত্রটিই এই নভেলের প্রাণ Smollett এর নভেল গুলোর গঠন শৈলী অত্যন্ত শিথিল। আসলে সেগুলোর Plot বলে কিছুই নেই। তাঁর Roderick Random হেনরী ফিল্ডিং এর অনুকরণে শেষ হয়েছে। এ নভেলের শেষে আমরা নায়ক নায়িকার বিয়ের বাদ্য শুনতে পাই। Smollett এর নভেলগুলো নায়কের দুঃসাহসিক অভিযান ও ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত সম্বলিত। পাঠকরা প্রশ্ন করেন, কেন তাঁর নভেল গুলো আর একটু অন্যাভাবে শেষ হলো না। তাঁর নভেলের অনেক Minor চরিত্র ও Minor Scene কে অতি সহজেই বাদ দেওয়া যেত। এতে পাঠকের একটুও অসুবিধা হতো না।

মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত দুঃখ-যাতনা যে অক্ষরে রূপ নিতে পারে তা দেখিয়েছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রিচার্ডসন। রিচার্ডসন মানব মনের গভীরের ক্রিয়া কলাপ নিয়ে লিখেছেন উপন্যাস। Human Psychology যে উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হতে পারে তা সর্বপ্রথম রিচার্ডসনই দেখান। এই বিষয়টি ইংরেজী সাহিত্যে সম্পুর্ণরূপে অভিনব। জানা যায় যে, কোন এক প্রকাশক রিচার্ডসনকে কিছু চিঠি রচনা করতে দিয়েছিলেন যেগুলো পড়ে শিক্ষানবীশরা চিঠি পত্র লেখা শিখবে। এছাড়া রিচার্ডসন বিভিন্ন বাড়ির চাকর-চাকরানীদের প্রেমপত্র লিখে দিতেন। এতে করে তিনি মানব মনের গহীনে উঁকি মারার একটা সুযোগ পেয়ে যান। উল্লেখ্য যে, রিচার্ডসন ছিলেন ধর্ম ভীরু, নীতিবাগিশ ও ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি। তিনি পিউরিটান আইডিয়ালিজমেও

বিশ্বাসী ছিলেন। এর ছাপ অবশ্য তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'পামেলা' হলো রিচার্ডসনের প্রথম উপন্যাস। এটা পামেলা নাম্নি পূত পবিত্র চরিত্রের এক ঝি এর কাহিনী। পামেলা বাড়ির কর্ত্রীর পুত্রের নানা প্রলোভনেও নিজেকে রেখেছে পবিত্র। পরিশেষে যুবকটি পামেলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তার চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে। 'ক্লারিসা' উপন্যাসে ক্লারিসার চরিত্র মাধুর্যের এক সুন্দর কাহিনী আমরা পাই। সে এক ধনী পরিবারে সুন্দরী মেয়ে। বাড়ির পছন্দ মত বিয়ে না করে সে আশ্রয় নেয় তার প্রেমিক লাভলেসের কাছে। লাভলেস তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু ক্লারিসা নিজের সতীত্বের মহিমাকে সমূজ্জ্বল রাখতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

হেনরী ফিল্ডিং যখন আইন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করছেন তখন তিনি সে সময়কার Sentimental রিচার্ডসনের 'পামেলা' উপন্যাসকে উপহাস করে রচনা করলেন জোসেফ এন্ড্রুজ। জোসেফ এন্ড্রুজকে ফিল্ডিং দেখালেন একজন নম্র, ভদ্র ও সচ্চরিত্রের মূর্ত প্রতিক হিসেবে যেমন রিচার্ডসন দেখিয়েছিলেন সতী সাধ্বী মহিলা হিসেবে। ফিল্ডিং এই সময়ের সমাজের অনেক অসংগত কির্তীকলাপ দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি মামলা মোকাদ্দমা পর্যালোচনা করতে গিয়ে উপন্যাস রচনার অনেক উপকরণ পেলেন। টম জোন্স (১৭৪৯) রচনার মধ্য দিয়ে ফিল্ডিং উঠে আসেন প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকদের সারিতে এবং সত্যিকারের উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে তিনি আজ ইংরেজী সাহিত্যের আকাশে সমূজ্জল।

ফিল্ডিংয়ের টম জোন্স্ Picaresque model এর উপর প্রতিষ্ঠিত। Picaresque নভেলের শক্তিশালী উপকরণ এতে বিদ্যমান।টম জোন্স একটি কুঁড়ে পাওয়া ছেলে যাকে দেখাশুনা করার আইনসিদ্ধ কোন পিতামাতা নাই। নানাবিধ কারণে তার পৃষ্ঠপোষক Squire Allworthy তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। টম জোন্স কিন্তু rascal নয়। Wickedness তার অন্তরে নাই। কেউ কেউ বলেন টম জোন্স হলেন Endearing rascal. কিন্তু তার Wickedness কিন্তু এই নভেলে অংকিত হয়নি। সরাইখানায় Mrs. Waters এর সাথে তার রাত্রি যাপন যৌবনের উন্মাদনারই নামান্তর। যাই হোক নভেলটি টম জোন্স এর Adventure, misadventure এবং উত্থান পতন নিয়ে আলোচনা করে। টম জোন্স যোগ দেয় বিভিন্ন যুদ্ধে। আহতও হয়। সে কিছু অদ্ভুত লোকের সাথেও মিলিত হয়, যেমন এক পাহাড়ী লোক এবং যাযাবর। যাইহোক, এসমস্ত ঘটনা লেখককে তৎকালীন সমাজচিত্র অংকনের উপকরণ সরবরাহ করে। উল্লেখ্য যে,

টম জোন্স পুরোপুরিভাবে Picaresque নভেল নয়। এর হিরো কি সত্যিই একটা লম্পট বা rascal ? এছাড়া এই নভেলের লেখকের উদ্দেশ্য moral এবং এই নভেলের Plot বেশ জোড়ালো যেখানে Picaresque নভেলের Plot হয় অসংগত বা incoherent এবং এক ঘটনার সাথে আর এক ঘটনার তেমন কোনই সম্পর্ক নাই।

Picaresque নভেলের ধারা Victorian যুগেও চলতে থাকে। চার্লস ডিকেন্সের Great Expectation, Pick Wick Papers, David Copperfield, Oliver Twist ইত্যাদি উপন্যাসগুলো Picaresque নভেলের আওতায় পড়ে। W.L Crossবলেন, "Oliver Twist is a Picaresque story humanized and given a realisting setting in the London Slums." Thackery's Vanity Fair নভেলেও আছে Picaresque নভেলের শক্তিশালী উপকরণ। Great Expectation এ Pip এর Adventures কিন্তু Picaresque নভেলের আওতায় পড়ে। আধুনিক অনেক নভেলেও Picaresque নভেলের উপাদান আছে, তবে এসব উপন্যাস আরো গভীর Observation দাবী করে সত্যিকারের সিদ্ধান্তে পৌছতে।

আমরা আগেই বলেছি যে, হেন্‌রী ফিল্ডিং ইংরেজী সাহিত্যের নভেলের স্রষ্টা। Picaresque নভেলকে যেমন তিনি সমৃদ্ধ করেছেন স্বীয় সৃজনী শক্তির গুণে, তেমনি সৃষ্টি করেছেন Panoramic নভেলের। Panoramic নভেল হলো কোন সময়ের একটি জীবন চিত্র। জনৈক সমালোচকের ভাষায়: In this kind of novel, the novelist ranges over a wide ground and provides a comprehensive picture of the life of the times. একটি panoramic নভেল সমাজের সমসাময়ীক জীবন যাপন পদ্ধতি পোষাক-আশাক, অভ্যাস, রীতিনীতি ইত্যাদি বিশাল (epical range) কলেবরে বর্ণনা করে। সমাজের প্রত্যেকটি দিক এতে অত্যন্ত জোড়ালো ভাবে বর্ণিত হয়। বর্ণনা থাকে বাস্তবতার রঙে রঞ্জিত। হেন্‌রী ফিল্ডিং এর 'টম জোন্স' একটি আদর্শ Panoramic নভেল যা প্রতিষ্ঠিত Epic Scale এর উপর। এটি ফিল্ডিং এর সমসাময়ীক কালের একটি গদ্য মহাকাব্য স্বরূপ। একেবারে তৎকালীন সমাজের বিশ্বস্ত আয়না স্বরূপ। Thackeray এর Vanity Fair ও একটি Panoramic নভেল বা ভিক্টোরিয়ান যুগের একটি বলিষ্ঠ সমাজ চিত্র।

নভেলের আর একটি শক্তিশালী শাখা (genre) হলো ঐতিহাসিক নভেল। ইতিহাসকে অবলম্বন করে নভেল রচনা করা যেতে পারে। যদিও নভেলের সংজ্ঞায় আমরা বলেছি যে, Novel is a fiction in prose to a

certain extent, তবুও মনে রাখা দরকার যে, ইতিহাস Fiction হতে পারে। Fiction হলো কল্পনা প্রসূত বা কল্পনার রং মিশ্রিত গল্প।এখন মনে হতে পারে যে, History বা ইতিহাস কিভাবে Fiction হতে পারে। ধরা যাক, কোন নাট্যকার নাটক লিখেছেন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার ইতিহাস অবলম্বনে। তিনি যখন নাটকের সংলাপ (dialogue) রচনা করেছেন, তিনি নিশ্চয় কল্পনার আশ্রয় নিয়েই তা করেছেন। তিনি নিশ্চয় জানেন না, সিরাজ উদ্দৌলা কিভাবে, কোন প্রসঙ্গে, কি কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি, পরিবেশ, প্রতিবেশ বিবেচনা করে নাট্যকার তার কলাপনার রং মাধূর্য মিশিয়ে সংলাপ রচনা করে। ঐতিহাসিক গণ ঐতিহাসিক ঘটনার সাল-তারিখ পরিবর্তন করেন না বটে - করতে পারেন না ; কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় ঘটনা বর্ণনায় তিনি কল্পনার রংতুলি ব্যবহার করেন সূক্ষ শিল্পীর মত। যাই হোক, স্যার ওয়ালটার স্কট ঐতিহাসিক নভেলের স্রষ্টা। তিনিই সর্বপ্রথম বাস্তব ও কল্পনা, ইতিহাস (History) ও রোমান্সের সমন্বয় ঘটান তার উপন্যাসে অত্যন্ত সফলতার সাথে। এক্ষেত্রে জনৈক সমালোচক বলেছেন, "The range of scott's novels is fairly wide and covers three centuries of English, Scottish and European History." আসলে স্কট সার্থক হয়েছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতে শুধুমাত্র সজীব কল্পনা শক্তির কারণে। Quentin Durward, The Fortunes of Nigel, Kenilworth ইত্যাদি স্কট এর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। Thackaray এর Henry Esmond ঐতিহাসিক নভেলকে একধাপ এগিয়ে নেয় কারণ এ নভেলের ইতিহাসের একটি কল্পনাসিদ্ধ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা পাওয়া যায়। এভাবে History এর সাথে Romance এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন Thackaray. এছাড়া W. H. Ainsworth, Charlse Reade, Charlse Kingsley প্রমূখ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে যথেষ্ঠ সুনাম কুঁড়িয়েছেন। বিংশ শতাব্দিতে ঐতিহাসিক নভেল লেখা হয়না বললে বড় একটা ভুল হবেনা। মডার্ণ যুগ সমস্যা জর্জড়িত যুগ ; Ism (বাদ) এর যুগ। বর্তমান যুগের উপন্যাস জুড়ে আছে মার্ক্স, ডারউইন, সিগমান্ড ফ্রয়েড প্রমূখ।

ঐতিহাসিক নভেল ছাড়াও এক বিশেষ ধরনের নভেল আছে যার সাথে চার্লস ডিকেন্সের নাম জড়িত। এটি হলো Novel of social Reform. তিনিই সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিক যিনি পাঠককে সমাজের দুষ্টক্ষতের সাথে পরিচয় করে দেন এই ধরনের নভেলের মধ্য দিয়ে। এভাবে তিনি সমাজের Evil গুলোকে সারাতে চেয়েছেন। এভাবে চার্লস ডিকেন্স সমাজ সংস্কারকের ভুমিকা পালন করেছেন। উপন্যাসকে সমাজ সংস্কারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার বানাতে তাঁর ভুমিকা

অগ্রগন্য। ডিকেন্সের ইচ্ছা হলো গরীব ও নির্যাতিতদের পক্ষ নিয়ে সমাজপতিদের পিঠে চাবুক বসিয়ে দেয়া। দিয়েছেনও বটে। "আ টেল অব টু সিটিজ" উপন্যাসে তিনি কষাঘাত করেছেন তথাকথিত সমাজ পতিদের, মার্কুইসদের পিঠে যারা কৃষক ও সাধারণত মানুষের বউ-মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ভালবাসে ; যারা গাড়ীর চাকায় সন্তানকে পিষ্ট করে শোকাহত পিতার দিকে একটি মুদ্রা ছুড়ে দেয় ; যারা মাত্রাতিরিক্ত কর আদায় করে জোর জবরদস্তি করে আর প্রজাকে উপদেশ দেয় ভাতের পরিবর্তে চকলেট বা ঘাস খেতে। Industrial Revolution এর Evil গুলো যার নির্মম শিকার ডেভিড কপারফিল্ডের মত শিশুরা - এ গুলোকে খুব শক্ত হাতে তুলে ধরেছেন Dickens তাঁর বিখ্যাত Autobiographical উপন্যাস David Coperfield এ। সেই সময় কোন কোম্পানি আইন বা Factory Law ছিলনা বলে মালিকরা নির্মমভাবে শাসন ও শোষণ করত ছোট ছোট ছেলেদের যারা সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত হাড় ভাঙ্গা পরিশ্যম করত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও ঝুকিপূর্ণ অবস্থানে আর সপ্তাহে এদের জনপ্রতি দেওয়া হতো ৬ বা ৭ শিলিং।

Physical novel নামে আর এক ধরনের নভেল আছে যাতে লেখক মানব মনের Motives (গতিবিধি), Impules এবং সুক্ষ পরিবর্তন গুলো পর্যালোচনা করেন। আসলে Psyche শব্দের অর্থ হলো Soul (গ্রীক শব্দ) আর Logus শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। George Eliot, Geirge Meredith, Samuel Richardson প্রমূখ মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত।

Regional Novel বা অঞ্চল ভিত্তিক নভেল নামে আর এক ধরনের উপন্যাস পাওয়া যায় ইংরেজী সাহিত্যে। এই ধরনের উপন্যাস সাধারণত কোন বিশেষ অঞ্চলের চাল-চলন, রীতি-নীতি, ইতিহাস ইত্যাদি পর্যালোচনা করে। তাই বলে এটা যে আঞ্চলিকতা (Regionalism) কে আষ্টেপৃষ্টে আঁকড়ে থাকে তা নয়। এই ধরনের উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তাঁর বিশেষ অঞ্চলের কিছু বিশেষত্বকে এমন ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন যাতে তা অন্য অঞ্চলের চাল-চলন, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার থেকে আলাদা হয়। অন্য অঞ্চলের আচার আচরনের সাথে বিশেষ অঞ্চলের আচার আচরনের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে লেখক তার উপন্যাসকে একটা World Wide বা বিশ্ব ব্যাপী জনপ্রিয়তা পাইয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সার্থক ও হন বটে। Brontee পরিবার ও টমাস হার্ডি Regional নভেল রচনার জন্য আজও স্মরণীয়। Regional novel সাধারণত democratic ধরনের হয়ে থাকে। ইহা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাধারণত মানুষ, তাদের সহজ সরল জীবন পদ্ধতি এবং সেখানকার প্রথা অনুযায়ী কাজ কর্ম

ইত্যাদি আলোচনা করে। সর্বোপরি লেখকের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ থাকার ফলে তিনি আবেগের ঘনীভবন ঘটাতে পারেন। টমাস হার্ডির 'Wessex Novels' এ ধরনের উপন্যাসের আওতায় পড়ে।

বর্তমান যুগে আর এক ধরনের উপন্যাস আছে। একে 'The Stream of consciousness' নভেল বলে। এই নভেলের প্রধান কাজ হলো মানব মনের গহীনে অনুসন্ধান করা। এই শ্রেণীর উপন্যাস লেখক পাঠকদের নিয়ে যায় তাঁর চরিত্রগুলোর হৃদয় মন্দিরে যেখানে তিনি আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন Sub-conscious ও এমনকি Unconcious level এর সাথে। এটা মানুষের consciousness এর হ য ব র ল (Chaos), অসঙ্গতি (incoherence) সাধারনের মধ্যে পরিব্যপ্ত গভীর আবেগের অভিব্যক্তি, মানব মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উধ: ও অধ:গমন ইত্যাদি সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করে। Henry James, James Joyce, Virginia Woolf, Dorothy Richardson প্রমূখ সাহিত্যিকগণ বেশ সাফল্যের সাথে এই ধরনের উপন্যাসের চর্চা করেন।

সাহিত্যে রাজনীতি

রাশিয়ার বলশেভিক দলের তুখোড় নেতা লেলিন একদা বলেছিলেন যে, 'সাহিত্যকে পার্টি নিয়ন্ত্রন করে।' লেলিনের এই বক্তব্য শুনে অনেকেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। যেসব কবি-শিল্পীগণ এই বক্তব্যের বিরোধীতা করেছিলেন তাঁদের বক্তব্য হলো সাহিত্য রচনায় বুর্জোয়া ব্যবসায়ী ও বনিকদের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ সহ্য করা গেলেও সাম্যবাদী রাষ্ট্রে সাম্যবাদী দলের নিয়ন্ত্রণ কোন মতেই সহ্য করা যায় না। মজার বিষয় হলো রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক মতবাদের সাথে কবির মতবাদের অভিন্নতা থাকলেও পার্টির নিয়ন্ত্রণ সহ্য করা যায় না যে কেন তা কেউ পরিষ্কার করে বলতে নারাজ।

আসলে সাহিত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আছে কি নেই - এটা এক তর্কের বিষয়। মহা তর্ক। এই প্রশ্ন শুনে কোন বুর্জোয়া কবি হয়ত বলবেন যে তিনি কোন রাজনীতি করেন না। কোন রাজনৈতিক দলের ধার ধারেন না বা সমর্থক নন। তিনি রাজনীতিকে নোংরা ও ঘৃণার বস্তু মনে করেন। তাহলে তিনি কি নিয়ে বা কেন কাব্য রচনা করেন ? উত্তরে তিনি বলবেন যে, শুধু নির্মল আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে তিনি কাব্য রচনা করেন। আসলে এরূপ মত পোষণকারী বুর্জোয়া কবি ভন্ড ছাড়া আর কিছুই নন। কারণ তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। রাজনীতি ছাড়া রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র ছাড়া কোন মানুষ নেই। কাজেই যুক্তি সঙ্গত ভাবেই রাজনীতি ছাড়া কোন মানুষ নেই - একথা অকাট্য সত্য।

যে কবি বুর্জোয়া জীবন দর্শনকে মেনে চলেন তিনি রাজনীতিকেও মেনে চলেন। রাজনীতি তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে গেছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বুর্জোয়া রাজনীতির ভিত্তিই হলো ব্যক্তিগত মালিকানা। আর এই ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে রাষ্টনীতি, শিল্পনীতি, সাংস্কৃতি নীতি ইত্যাদি। কবি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করুন বা নাই করুন, তাঁকে এসব নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে সাহিত্য রচনা করতে হয়।

একজন সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার পিছনে একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকেই। যদি বলি থাকে না- তবে ভুল হবে। মস্ত ভুল, একজন শিল্পী বা সাহিত্যিক তাঁর যুগেরই সৃষ্টি। শিল্পীর চলন বলন ও মননে মিশে থাকে তার যুগের ও পারিপার্শ্বিকতার ছাপ। বিশাল বায়ু সমূদ্রে বাস করে যেমন অক্সিজেনের উপস্থিতিকে অস্বীকার করা হাস্যকর তেমনি একটি যুগের ধারা ও গতানুগতিক মতলবকে বাদ দিয়ে কবি ও সাহিত্যিকের মূল্যায়ন করাও অবান্তর। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরীজ, স্কট পারেননি ফরাসী বিপ্লবের সময় মুখে ছিপি এঁটে থাকতে। এঁরা ফরাসী বিপ্লবের বিরোধীতা করেছিলেন। তাইতো সি. এইচ. হারফোর্ড বলেছেন যে, ''বিপ্লবের বিরোধী ওয়ার্ডওয়ার্থ ও কোলরীজ ছিলেন এমনকি দলত্যাগী বিস্বাসঘাতক।''ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি ও পোয়েট লরিয়েট টেনিসন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমর্থন করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে। তিনি ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ যা সিপাহী বিপ্লব নামে খ্যাত তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সাময়িক অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে 'দি ডিফেন্স অব লক্ষ্ণৌ' নামে কবিতা রচনা করেছেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক সমারসেট মম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন এবং গুপ্তচর হিসেবে রাশিয়ায় গিয়েছেন। এমনকি বাংলা সাহিত্যিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যিনি রাজনীতিকে পরিহার করার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন তিনিও রাজনৈতিক সচেতনতা দিয়ে বুর্জোয়া মালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতিকে সমর্থন করেছেন এবং রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কতন্ত্রের বিরোধীতা করে বলেছেন, ''ডিকটেটরশীপ একটা মস্ত আপদ, যে কথা আমি জানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটেছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি।'' ম্যাক্সিম গোর্কী সাধারণ ও শোষিত মানুষের হয়ে কলম ধরেছেন। ইংরেজ কবি শেলীও গর্জে উঠেছিলেন শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। তিনি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইংরেজ চার্চ সমূহকে যা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে শাসিত, শোষিত ও নির্যাতিত করে। লর্ড বায়রনও এ বিষয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। সমাজের ভন্ডামী ও অন্তর সারশূন্য নীতি শিক্ষাকে তিনি তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন। সুতরাং জ্ঞাতসারেই হোক, বা অজ্ঞাতসারেই হোক, সাহিত্যিককে কোন না কোন রাজনৈতিক মতকে সমর্থন করতেই হয়। কখনও তিনি সমর্থন করেন বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনীতিকে আবার কখনও বা শোষিত মানুষের সাম্যবাদী রাজনীতিকে করেন সমর্থন।

সাম্যবাদী কবি বা শিল্পী কখনও ব্যবসায়ীর মানিব্যাগে ঢুকে পড়ে না কারণ সাম্যবাদী দর্শনই তাঁর কাব্য রচনার প্রধান উপকরণ ও জীবন দর্শন। সাম্যবাদী কবি সাম্যবাদী দর্শনের কেন্দ্রস্থলে দাড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখোশ খুলে দেবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এটাই তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য। তাঁর নৈতিক চেতনার আদর্শ ইস্পাতের মত মজবুত। তাই একটা শান্তিপূর্ণ, নিশ্চিত, নিরূপদ্রপ জীবনের লোভে বুর্জোয়া কবিদের মত ব্যবসায়ীদের সামনে মাথা নত করে না। বৈপ্লবিক শক্তির চেয়ে সাম্যবাদী শিল্পীর নৈতিক চেতনা আরও শক্তিশালী। আর একটা কথা না বললেই নয় আর তা হলো যে সাম্যবাদী কবি কখনই সাহিত্য রচনাকে পেশা হিসেবে নেয় না কারণ এর সুযোগ নেই এখানে। তাঁর জীবনের ব্রত হলো সর্বহারার সংগ্রামের সাথে নিবিরভাবে যুক্ত থাকা। সংগ্রামী ক্রিয়া কলাপকে সাহিত্যে রূপদানই তার অন্যতম প্রধান কাজ। বাংলা সাহিত্যের কাজী নজরুল তো সর্বহারার দলেই আছেন বলে নিজেই ঘোষাণা দিযে ফেলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সাম্যবাদ বিরোধী কবি যিনি ব্যক্তি মালিকানার (বুর্জোয়া গণতন্ত্র) সমর্থক ছিলেন। ম্যাক্সিম গোর্কী ছিলেন সাম্যবাদী শিল্পী যিনি কখনও বুর্জোয়া কবির মতে বিশ্বপ্রেমিক সেজে ভন্ডামী করেন নি। তাঁর কাছে শ্রেণী বিহীন বিশ্বপ্রেম বলে কিছু নেই। যে মানুষ শোষক, যে মানুষ শাসক ও অন্যায়কারী তাকে তো শোষিত মানুষ ভালভাসতে পারে না। শোষিত মানুষের পক্ষে এটা অবাস্তব, সাম্যবাদী কবির পক্ষে এটা অসম্ভব।

রোমান্টিসিজম

উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্থের লিরিক্যাল ব্যালাড প্রকাশের মধ্য দিয়ে ১৭৯৮ সালে যে রোমান্টিক যুগের সূচনা হয়, তা নানা ভাবে, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে টিকে থাকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত। এ বছর টি. এস. এলিয়ট তাঁর বিখ্যাত Love song of J. Alfred Prufrock প্রকাশের মধ্য দিয়ে যেন রোমান্টিসিজমের বিলুপ্তি ঘোষনা করেন। কবিরা হয়ে ওঠেন বাস্তব বাদী ও আধুনিক যুগের সমস্যা গুলির বলিষ্ঠ কণ্ঠ। কবি-সাহিত্যিকরা চলে আসেন বাস্তবতার Waste Land এ কল্পনার সেই Nightingale এর দেশ থেকে।

রোমাঞ্চ শব্দটা শুনলে যদিও মনের মধ্যে একটু শিহরণ জাগে, প্রেমবোধ জাগে, আসলে রোমাঞ্চ একটা গুঢ় ও ভাবগর্ভ শব্দ। প্রেমে পড়লে মানুষ রোমান্টিক হয়ে যায় বটে, তবে রোমান্টিসিজম শুধু প্রেমেই সীমাবদ্ধ নয়। আজ পর্যন্ত রোমান্টিসিজমের সংজ্ঞাও সঠিকভাবে নিরূপন করা সম্ভব হয়নি। C. H. HERFORD এর মতে, "Romanticism is the extra ordinary development of imaginative sensibility." আসলে কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু রোমাঞ্চ বা রোমান্টিসিজম পাওয়া সম্ভব নয়। রোমান্টিসিজম যদি গাড়ী হয় তবে কল্পনা হলো এর চাকা যা ছাড়া গাড়ী নিশ্চল। Walter Pater বলেছেন, "Romanticism is the addition of strangeness to beauty." অর্থ্যাৎ সৌন্দর্যের সাথে বিস্ময়ের পরিণয়কেই বলা যায় রোমান্টিসিজম। Watts Dunton তো বলেই ফেলেছেন যে," Romanticism is the renaissance of wonder." আসলে রোমান্টিসিজম সব মিলিয়ে এক দুর্বোধ্য বিষয়। এই যে Sense of Wonder যা Watts Dunton উল্লেখ করলেন, তাই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাহিত্যের Fashion হয়ে গিয়েছিল। ক্ল্যাসিকাল লেখকগণ শিশুসূলভ বিস্ময়ের যে Sense বা বোধ তা হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের মতে পৃথিবীটা একটা Film of Familiarity দ্বারা আবৃত এবং তাঁরা সাধারণ উপাদানগুলোর পশ্চাতে যে গুঢ় অর্থ নিহীত আছে তার পরোয়া করেন না। কিন্তু যাঁরা রোমান্টিক তাঁরা উঁকি দেন সারল্যের বা পরিচিতের ঘোমটা ভেদ করে অতি পরিচিত জিনিসের প্রতি। সামান্যের মধ্যে তাঁরা অসামান্যকে উপলব্ধি করেন ; অসুন্দরের মধ্যে তাঁরা সুন্দরের সন্ধান লাভ করেন ; নিরসের মধ্যে থেকে তাঁরা রস আহরণ করেন। তাইতো জনৈক সমালোচক রোমান্টিসিজমের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ

"One poet is Romantic because he falls in love ; another romantic because he sees a ghost ; another romantic because he hears a cuckoo ; another romantic because he is reconciled to the church."

রোমান্টিক কবিতা ছিল নিও ক্লাসিক্যাল কবিদের কবিতার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। ড্রাইডেন, পোপ ও অন্যান্য কবিদের কবিতা তাঁদের তিক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ততার ফসল। এসব কবিতা টাউন লাইফের উপর ভিত্তি করে রচিত। নিও ক্লাসিক্যাল কবিতা বাধা ধরা কিছু নিয়ম মেনে লেখা হতো। কিন্তু রোমান্টিক কবিতা হলো নিও ক্লাসিক্যাল কবিতার বাধা ধরা নিয়মের তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ। নিও ক্লাসিক্যাল কবিতার ভ্যারাইটি বা বৈচিত্র নেই বললেই চলে। এরা একই ইমপ্রেসন তৈরী করে। কিন্তু রোমান্টিক কবিতা বৈচিত্রে ভরা কারণ এক এক কবির কল্পনার জগত এক এক রকম যেখানে বাধা ধরা নিয়মের যাঁতাকল কবিকে নির্যাতন করে না।

নিও ক্লাসিক্যাল কবিতা বন্দী ছিল সুসজ্জিত Drawing Room, কফি হাউস ও জৌলুস পূর্ণ অন্দরে। লন্ডনের শহুরে জীবন, সাহেব-বিবির রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার, এবং অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের লোক দেখানো জীবন প্রণালী ছিল নিও ক্লাসিক্যাল কবিতার বিষয় বস্তু। প্রকৃতি বা Nature নিও ক্লাসিক্যাল কবিতায় প্রাধান্য করতে পারত না, কারণ কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু রোমান্টিক কবিগণ কবিতার বিস্তৃতি নিয়ে গেলেন একেবারে অজ পাড়া গাঁ পর্যন্ত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো তাঁর প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালাড্‌সে এ সম্বন্ধে বেশ জোড়ালো ভাবে ঘোষণা করেইছেন। একজন রোমান্টিক কবি হবেন উদার মনের অধীকারী। প্রকৃতির সানিধ্যে বসবাস রত সাধারণ মানুষ, বিস্তৃত ফসলের মাঠে কর্মরত কিষানী, প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা ছোট্ট মেয়ে ইত্যাদি হবে কবিতার উপজীব্য। রোমান্টিক কবি কখনই সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে থাকে না। সে একজন মানুষ আর সবার মত এবং সে মানুষের কথাই বলবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর একটু মনগত পার্থক্য আছে, আর তা হলো কবির একটি স্পর্শকাতর ও ভাবুক মন আছে যা সাধারণ মানুষের নেই। সকালের সুর্যোদয় কবির কবিসত্ত্বাকে নাড়া দেয়, কিন্তু সাধারণ মানুষ থাকে নির্লিপ্ত। একটু রোমান্টিক কবিকে সহজেই আপ্লুত করে পাখির কলবর, নদীর কূল কূল ধ্বনি, বিশাল প্রান্তরের নিস্তব্ধতা, দূর থেকে ভেসে আসা কোকিলের গান অথবা পথের ধারে ফোটা সামান্য ঘাস ফুল পর্যন্ত।

শিল্প বা আর্ট

আর্ট বা শিল্প হলো এক বিশেষ শৈলী যা পাঠক বা দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আমরা যেসব শিল্প কর্মকে গঠনযোগ্য, নমনীয় ও ত্রিমাত্রিক বা Plastic, দৃষ্টিলব্ধ, চাক্ষুষ বলে চিহ্নিত করি, তার সাথেই শিল্প শব্দটির গভীর সম্পর্ক। শিল্প সাহিত্যের মূল উপাদান হলো চারটি - শিল্প বস্তু, শিল্পী বা স্রষ্টা, জগৎ এবং উপভোক্তা বা পাঠক বা দর্শক। এম. এচ. এব্রাম্‌স এর মতে শিল্প-সাহিত্যের যে কোন তত্ত্ব এর কোন একটির উপর জোর দেয়।

শিল্প রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তত্ত্ব অপেক্ষা অধীকতর সমৃদ্ধ ও অস্বচ্ছ। শিল্প অস্বচ্ছ কারন ইহা খুব বেশী মতাদর্শগত নয়। শিল্প মানুষকে নানা সময়, নানা অবস্থায়, নানা দেশে নানা অর্থ দেয়। সুইমিং পুলের স্ফটিক স্বচ্ছ পানির কোথায় কি আছে তা সহজেই বোধগম্য পানিতে না নেমেও। কিন্তু পুকুরের বা নদীর ঘোলা পানির গভীরে কি লুক্কায়িত আছে তা জানার এক ব্যগ্র উৎসুক্য জাগ্রত থাকে দর্শকের মনে। শিল্পের কাজই হলো মানুষকে thoughtful বা ভাবুক করে তোলা। সকল শিল্পই মতাদর্শে সিক্ত আর তাই এরা মানুষকে আকর্ষণ করে। মানুষ তার মস্তিষ্কের উর্বরতা বর্ধক চিন্তা, চেতনা ও Idea বা ধারণ লাভ করে শিল্প থেকে।

শিল্পের কোন জাত নেই, শিল্পীর কোন জাত নেই। একজন প্রকৃত শিল্পী কখনই Spontaneous overflow of powerful feelings এর উপর পুরোপুরি নির্ভর করে না। শিল্পীর ভাবুক মন সর্বদা ব্যগ্র থাকে বাইরের দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি জানতে। পড়ার বিষয়ে তাঁর কোন ব্যক্তিগত জটিলতা নেই। তিনি যেমন হোমারকে পড়বেন, তেমনি তাঁর সমসাময়িক শিল্পীর শিল্পকর্ম সম্বন্ধেও তিনি সচেতন হবেন। শিল্পকে উপলব্ধি করার জন্য শিল্পীর মন সর্বদা প্রস্তুত থাকে। যে শিল্পী মনের অধিকারী সে পথ চলতেও শিল্পের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। কখনও বা তাঁকে দেখা যাবে কোন পোস্টারের সামনে ৩০ সেকেন্ড বা ৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আপন মনে কি যেন ভাবছে। তারপর নানা বিশেষণে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করবে।

শিল্প মানুষকে কল্পনার জগতে নিয়ে যায় বাস্তবতার রথে চাপিয়ে। চিত্রকর্ম একটা বড় শিল্প। একে Dumb Poetry ও বলা হয়। একটা চিত্রকর্ম

মানুষকে (অবশ্য Sensitive মানুষ) অতি অল্প সময়ে যা শেখাতে পারে, ১০০০ শব্দও তা প্রচুর সময়েও পারে না। ধরা যাক একটা ছবিতে বিশাল প্রাচীর দৃশ্যমান। প্রাচীরটির নির্মানকাজ শেষ হয়ইনি। এর এক প্রান্তে এখনও কিছু মানুষ নিরলস কাজ করছে। আর অপর প্রান্তে কিছু লোক ইট-পাথরগুলো দেয়াল থেকে খুলে খুলে নিয়ে যাচ্ছে। এখন এই চিত্রকর্মটি কি শেখায় আমাদের। একজন শিল্পীমনা এর মর্ম সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। বিশাল উচু প্রাচীরটিকে যদি আমরা সভ্যতা ধরি তবে অর্থ বেশ পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, একদল নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে সভ্যতা গড়তে। আর কিছু সমাজপতি খামখেয়ালীর বশে সভ্যতার ইট-পাটকেল খুলে ফেলে নাজুক করে ফেলছে আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবীটাকে। এরা যুদ্ধ বিগ্রহ সৃষ্টিতে ওস্তাদ আর রক্ত দিয়ে এদের পিপাসা মেটায় সাধারণ মানুষেরা যারা সভ্যতা গড়ে এবং চিনির বলদের মত ফলভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সালভাদোর দালি নামক জনৈক বিখ্যাত চিত্রকর ল্যান্ডস্ক্যাপ ঃ দ্য পারসিসটেন্স অফ মেমোরি নামক চিত্রকর্মে দেখিয়েছেন যে, কিছু ঘড়ি গলে গলে পড়ে যাচ্ছে। এই চিত্রকর্মটি অনুসন্ধিৎসু মনের পাঠককে এই অর্থই দেয় যে, সময় এখন আর মানুষের কন্ট্রোলে নেই। মানুষ এখন ক্লক টাইম ছেড়ে সাইকোলোজিক্যাল সময়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যাই হোক, সত্য কথা বলতে কি যে, শিল্পের মধ্যে এক ধরনের প্রভাব সৃষ্টি বা সংক্রমনের গুণ আছে, যা ..... নিছক শৃংখলা বা আন্ত: সম্পর্কের অনুধাবন মাত্র নয়। প্রত্যকটি অংশ, এবং সমগ্র, এক্ষেত্রে এক আবেগের মায়াটানে ভরে ওঠে। আসলে ত্রুটিহীন, কোন উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে সমস্ত উপাদানই থাকে আত্ম সম্পর্কে প্রথিত ; উপাদান সমূহ সেখানে এমন ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় যে যার মূল্য এ সমস্ত উপাদানের নিছক যোগফলের চেয়ে বেশী কিছু। হুইসলার বলেছিলেন যে, তিনি রং মেশান মস্তিস্ক দিয়ে। জার্মনিতে লোকে বলে যে, মানুষ রক্ত দিয়ে ছবি আঁকে। আসলেই কথাটা ঠিক। সত্যিকারের ছবি শিল্পের রংতুলি নয়, রক্তেই আঁকা যার সাথে তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও সার্বজনীন স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া জড়িয়ে থাকে। এটা দর্শকের রক্তকেও উষ্ণ ও স্পন্দিত করে। হয়তো তাই গ্রীসের ভস্মাধারের বাইরের গাত্রের চিত্রকর্ম নাড়া দিয়েছিল কীটসের কবি হৃদয়কে।

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জনক

ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, এটি "One of the Germanic languages which form a group of the great family of Indo-European languages". পৃথিবীতে যত ভাষা আছে তার মধ্যে ইংরেজী সবচেয়ে নমনীয় (Flexible), সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রপূর্ণ ভাষা। এটা প্রাচীন Anglo-Saxon যোদ্ধাদের ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। Anglo-Saxon জাতি ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড আক্রমন ও দখল করে। এঙ্গলো স্যাক্সনদের ব্যবহৃত শব্দগুলি আবার অসংখ্য উৎস থেকে গৃহিত হয়েছিল। প্রায় তের শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে ইংরেজ জাতি যাদেরই সংস্পর্শে এসেছে, তাদেরই ভাষার শব্দ দ্বারা নিজেদের শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ফরাসী, রোমান, স্পেনিশ অথবা চেকোশ্লাভাকিয়া একটা স্থায়ী ছাপ ফেলেছে ইংরেজী ভাষার শব্দ ভান্ডারে। রোমানরা যাদের সাথে প্রাচীন জার্মান জাতির লেনদেন ছিল, ল্যাটিন ধর্ম প্রচারক যারা ডেনিশ ও নরওয়ের ভাষা আয়ত্ত করেছিল এবং নরমানরা যারা ফরাসী, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার পূণর্জীবন দিয়েছিল তাদের অবদান ইংরেজী ভাষার শব্দ ভান্ডারে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ষোড়শ শতাব্দীর ইতালিয়ান Artist গণ আরব গণিতজ্ঞগণ যারা স্পেনে বাস করতেন, আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরাও ইংরেজী ভাষার খোড়াক যুগিয়েছে।

এঙ্গলো স্যাক্সনরা ইংল্যান্ডে জার্মানিক ল্যাঙ্গুয়িজ নিয়ে আসে এবং ইংল্যান্ডের আদি অধিবাসীদের ব্যবহৃত কেলটিক ল্যাঙ্গুয়িজ খুব কমই গ্রহন করেছিল। এঙ্গলো স্যাক্সন ভাষার নতুন নতুন শব্দ তৈরী ও নতুন নতুন চিন্তা চেতনা প্রকাশের এক অদ্ভুত ক্ষমতা বিদ্যমান। এঙ্গলো স্যাক্সন ভাষা সম্বন্ধে একজন জনৈক সমালোচক বলেছেন যে, "It is vigorous, adaptable and expressive." এঙ্গলো স্যাক্সন ভাষার অসংখ্য শব্দ বর্তমান ইংরেজী ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

১০৬৬ সালে এডওয়ার্ড দি কনফেসরকে হত্যা করে ইংল্যান্ডের ক্ষমতায় আসে হ্যারোল্ড। কিন্তু হ্যারোল্ড মাত্র কয়েক মাস দেশ শাসন করার পর তাঁকে উৎখাত করে নরমানদের শক্তিশালী শাসক এডওয়ার্ড দি কনকয়রার। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যান্ড আসেন। সাথে নিয়ে আসেন নরমান ভাষা, কৃষ্টি ও কালচার। সেসময় যেহেতু ইংল্যান্ডের শাসকের ভাষা

নরমান, তাই ইংরেজ সামন্তরা নরমান ভাষা শিখতে রাজনীতিগত দিক থেকে বাধ্য হলো। অর্থ্যাৎ অভিজাত শ্রেণী বা শাসক শ্রেণী ক্রমে ক্রমে নরমান ভাষা আয়ত্ব করে ফেলল। অপর পক্ষে যারা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোক তারা সচরাচর ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করত। আর নিম্ন শ্রেণীর মানুষ যারা তারা এঙ্গলো স্যাক্সন ভাষা ব্যবহার করতে থাকে। এভাবে ইংল্যান্ডে একই সাথে তিনটি ভাষার সমান দৌরাত্ম চলল নরমানদের যুগে। ইংরেজী ভাষার বুনিয়াদ শক্ত হতে আরম্ভ করল।

উল্লেখ্য যে, চসারের পূর্বে ইংল্যান্ডের কোন জাতীয় ভাষা ছিল না। চসারের পূর্বে শুধু কিছু রিজিওনাল (regional) ভাষা ছিল। চসার এই রিজিওনাল ভাষা গুলির একটিকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করেন তাঁর রচনায়। তিনি যে রিজিওনাল ভাষাটি ব্যবহার করেন তা হলো East Midland ভাষা। এই ভাষাকে চসার তাঁর কবি প্রতিভার শানানো শক্তিতে উন্নীত করেন জাতীয় ভাষার লেভেলে বা কাতারে। এজন্য তাঁকে ইংরেজী ভাষার জনক বলা হয়।

যদিও চসারকেই ইংরেজী সাহিত্যের সূচনার পথিকৃত ধরা হয়, মনে রাখা আবশ্যক যে চসারের পূর্বেই ইংরেজী সাহিত্য এর জয় যাত্রা শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে এভাবে বলা যায় যে, চসারের পূর্বে এঙ্গলো স্যাক্সন যুগে ইংরেজী সাহিত্য কচ্ছপের গতিতে যাত্রা শুরু করে, আর চসার তাতে দান করে খরগোসের ক্ষীপ্র গতি। এছাড়া চসারের সমসাময়ীক Gower ও Langland ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কবিতা বর্তমান যুগে খুব কমই পাঠ করা হয়। Gower ও চসারের মত পন্ডিত ছিলেন নরমান, ল্যাটিন ও এঙ্গলো স্যাক্সন ভাষায়। কিন্তু তার Treatment of these Languages কৃত্রিম বা Artificial মনে হয়।

চসারের কবিতাগুলো কালের করাল গ্রাসকে উপেক্ষা করে আজও চির ভাস্বর হয়ে বেঁচে আছে যে কারণে তা হলো এর মডার্নিজম। (টেরি ঈগলটনের মতে "The word modernism generally refers to a form of contemporary culture, whereas the term post modernity alludes to a specific historical period.) চসারের মডার্নিজম নিহীত তাঁর কবিতার Realism এর মধ্যে। তাঁর কবিতায় অংকিত সমাজ ও জীবন বাস্তব সম্মত। কৃত্রিমতার অস্থায়ী ও বিভ্রান্তিকর রং একে লেপন করতে পারে নি। এছাড়া চসারের সূক্ষ জীবন দর্শন, রাজ দরবারে থেকে রাজকীয় ও বিলাস

বহুল জীবন যাপন প্রণালীর পর্যবেক্ষণ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মানসিকতার উপলব্দী, যুদ্ধবন্দি হিসেবে তিক্ত অভিজ্ঞতা, কূটনৈতিক হিসেবে ইটালি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তাঁর কবিতাকে দিয়েছে এক বৈচিত্রময় জগত, যে জগত সবার কাছে গ্রহণ যোগ্য সমান ভাবে আজও। অধিকন্তু চসার তাঁর কবিতার কাঁচামাল সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন উৎস থেকে। ফরাসী, ইতালিয়ান, ল্যাটিন ইত্যাদি সাহিত্যের জনপ্রিয় বই পুস্তক তৎকালীন সময়ে তিনি খুব ভাল ভাবেই পড়েছিলেন। তাঁর ব্যাপক পড়াশুনা তাঁর সৃষ্টিকে করেছে সমৃদ্ধ বহুগুণে।

এডওয়ার্ড আলবার্ট তাঁর 'History of English Literature' বইয়ে বলেছেন যে, "Chaucer is the earliest of the great moderns." চসার ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষপ্রান্তের এবং আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নের কবি। তাইতো তাঁর কবিতায় একাধারে মধ্যযুগের Spirit ও ইতালিয়ান পুনর্জাগরণের এক উদাত্ত সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। চরিত্র চিত্রণে চসার অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে A. C. Ward বলেন, "Chaucer is the first great painter of character." তাঁর চরিত্র গুলো প্রাণবন্ত এবং তাঁরা সবাই চতুর্দশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বকারী। সত্য কথা বলতে কি, চসার তাঁর কবিতায় তাঁর সমসাময়ীক কালের খন্ডচিত্র অংকণ করেননি, বরং পুরো সমাজ জীবনকে অংকণ করেছেন Realism এর রংতুলি দিয়ে।

জনৈক সমালোচক চসারকে বলেছেন, "The morning star of the Renaissance." চসার তাঁর কবিতায় মধ্য যুগীয় Poetic tradition ত্যাগ করেছেন। মধ্য যুগীয় কবিতা ধর্মের যে অভেদ্য বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল তা ভেদ করে বেড়িয়ে আসেন চসার। যদিও Eulestical ideas and medieval habits ছিল চসারের যুগের Controlling elements, চসার এসবের অন্তরালে আটকা পড়েননি। পড়বেনই বা কেন, তিনি যে সত্যিকারের কবি।

ইংরেজী সাহিত্যের সর্বপ্রথম রসাত্মক (Humorist) লেখক হিসেবে কৃতিত্বের দাবীদার চসার। তাঁর Humour তাঁর জীবন সম্বন্ধীয় আনন্দ আস্বাদনের প্রকাশ মাত্র। তিনি যে Humour ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায় তা সহমর্মিতা সহানুভূতি ও সমবেদনার ঔদার্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তিনি কখনই বিদ্রুপের চাবুক কষেননি অন্যায়ের বা পাপের (Vice) পিঠে।

বরং মৃদু হাস্যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে অত্যন্ত রসাত্মক ভাব দেখিয়ে দিয়েছেন সমাজের দুষ্টক্ষত গুলোকে।

চসারের কবিতার ভাষা অত্যন্ত ছন্দময়। শব্দ চয়ন, উপমা ও রূপকের ব্যবহার, ছন্দ বা Verse এর প্রয়োগ (Iambic Pentametre), P, K ও T sound এর চমৎকার ব্যবহার ইত্যাদি তাঁর কবিতাকে দিয়েছে প্রাঞ্জলতা ও Universal appeal. যদিও প্রথমেই পাঠক একটু বিড়ম্বিত হয় কবির ব্যবহৃত শব্দগুলোর বানান রীতির দ্বারা, কিন্তু সামান্য শ্রমেই ইহা হয়ে ওঠে সহজবোধ্য ও ছন্দময়। এছাড়া চসারের কবিতায় যে চমৎকার বর্ণনার ঝংকার শুনা যায়, তার তুলনাই বা কোথায়। এডওয়ার্ড আলবার্ট বলেছেন, "Chaucer's best descriptions of man, manners and places as when giving details of conventional spring morning and flowery gardens, have a vivacity that makes his poetry unique."

চসারের বর্ণনারীতি এত চমৎকার যে, S. D. Neil তো বলেই ফেলেছেন যে, চসার যদি Troilus and Cressyde গদ্যে লিখতেন তাহলে রিচার্ডসনের Pamela নয়, বরং Troilus and Cressyde -ই ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পেত।

চসার কবি হিসেবে এতটাই সার্থক যে, তাঁর কবিতার Minor কিছু ভুল পাঠকের চোখেই পড়ে না। তাঁর কবিতাগুলো Lyrical হওয়া স্বত্বেও খুব বেশী Passion বা Imagination এ এগুলো সমৃদ্ধ নয়। তবুও চসার ইংরেজী সাহিত্যের পাঞ্জেরী স্বরূপ। তাইতো তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় ১৭০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল ইংরেজ জাতিকে একজন ভাল, Creative কবির জন্য। এই দীর্ঘ শুন্যতার পর ইংরেজী সাহিত্যের আকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর নাম এডমান্ড স্পেনসার।

রেনেসাঁ

ইতালীতে রেনেসাঁ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় কৃষ্টি কালচারের পরিসমাপ্তি ঘটতে শুরু করে। ইতালী রেনেসাঁর লালন ভূমি। ইতালী বললে একটু ভুল হয়। সেকালে ইতালী পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল - মিলান, ভেনিস, রোম বা প্যাপাল ডোমেইন, ফ্লোরেন্স ও নেপল্‌স। রেনেসাঁ সবচেয়ে বেশী পুষ্ট হয় ফ্লোরেন্সে কেননা সেকালে ফ্লোরেন্স সবচেয়ে বেশী Cultured ও সভ্য ছিল।

রেনেসাঁর ভাবাবেগ প্রথমত কয়েকজন বিদগ্ধ পন্ডিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন পেট্রার্ক রেনেসাঁর ভাবাবেগে সিক্ত ছিলেন প্রথম সামান্য কয়েক জনের মধ্যে । অতপর ধীরে ধীরে সব শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তির মধ্যে এর বীজ বপীত হয় এবং তা অংকুরিত হয়ে ধীরে ধীরে ডাল পালা বিস্তার করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত ইতালীয়ান রেনেসাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে লিও নার্দো দা ভিঞ্চি ও সামান্য কয়েকজন ছাড়া কেউ বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখতেন না। রেনেসাঁ বিজ্ঞানকে যতটা না উৎসাহিত করেছে তার চেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল Adventure বা অভিযানকে।

রেনেসাঁ যখন ইতালীর বাইরে আসতে শুরু করল তখন মানুষ অজানাকে জানার ও অদেখাকে দেখার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল দিকে দিকে। মানুষ পূর্বে অজানাকে ভয় পেত, সেই মানুষ রেনেসাঁর যাদুর কাঠির স্পর্শে হয়ে উঠল Curious বা উৎসুক। প্রবল কৌতুহলে সে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে বেড়িয়ে পড়ল। রেনেসাঁর একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো এটা মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছে প্রচলিত ঘুণে ধরা বিশ্বাস, নীতিমালা ও সংস্কারের বিরূদ্ধে প্রচন্ড বিদ্রোহ। মানুষ এত দিনের লালিত প্রথাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে তৎপর হয়ে ওঠে।

রেনেসাঁ মানুষকে দিয়েছে দিগ্ বিদিক জয় করার এক অদম্য ইচ্ছা। এত করে মানুষ চিন্তাশীল হয়ে ওঠে। চিন্তাশীল মানে এই নয় যে, সে দার্শনিক ভাবধারা চর্চা করতে শুরু করে। আসলে রেনেসাঁ বিজ্ঞান ও দর্শনকে নিরুৎসাহিত করেছে। এছাড়া মানুষ প্রচলিত ধ্যান ধারনায় সন্দেহ করতে শুরু করে। রেনেসাঁর অপকারিতা বলতে উল্লেখ করা যায় যে, এটা মানুষে মানুষে সৌহার্দ কমে দিতে শুরু করেছিল। বর্তমানে A great city is a great solitude (Bacon) এ কথাটির সত্যতা আনয়নে রেনেসাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মার্লোর 'ডক্টর ফস্টাস' ও রেনেসাঁ

রেনেসাঁকে আত্ম প্রত্যয় ও আত্ম প্রকাশের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনেকেই। আসলে রেনেসাঁ শব্দের অর্থ হলো পুণর্জাগরণ। এ যেন জন্মান্তর বাদেরই সমার্থক শব্দ। রেনেসাঁর মাতৃভূমি হিসেবে যদিও ইতালিকে চিহ্নিত করা হয়, তথাপি এই প্রসঙ্গটি আলোচনার দাবী রাখে। রেনেসাঁকে বুঝার জন্য তৎকালীন ইতালির রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে হবে। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের মৃত্যুর পর ১২৫০ সালে ইতালি ১৪৯৪ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক আধিপত্য বা আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। ১৪৯৪ সালে ফরাসী রাজা ৮ম চার্লস ইতালি আক্রমণ করেন। সে সময় ইতালি পাঁচটি নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো মিলান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, প্যাপাল ডোমেইন বা রোম এবং নেপলল্‌স। এগুলো ছাড়াও আরও ছোট ছোট রাজ্য ছিল যা রাজার শাসনাধীন ছিল। এসব ছোট ছোট রাজ্যের শাসকগণ বড় বড় রাজ্যের রাজাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ১৩৭৮ সাল পর্যন্ত জেনোয়া ব্যবসা বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পরে ইহা মিলানের প্রজা হয়ে যায়।

আসলে রেনেসাঁর মাতৃভূমি হলো ফ্লোরেন্স। রোম এবং অন্যান্য রাজ্য যখন দেশ জয়ে ব্যস্ত ফ্লোরেন্স তখন শিল্প সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট। লিও নার্দো দা ভিঞ্চি এবং মাইকেল এঞ্জেলোর মত বৈপ্লবিক চিন্তাশীল শিল্পীর লালন করে ফ্লোরেন্স। অনেক রহস্যময় অভিব্যক্তি, প্রাণের আর্তি ও প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে লিও নার্দো ও মাইকেল এঞ্জোলোর অনেক অসম্পুর্ণ মূর্তিতেও।

ইংল্যান্ডে রেনেসাঁর হাওয়া লাগে চতুর্দশ দশকের শেষ দশকে। ঠিক করে বলতে গেলে কলম্বসের আমরিকা আকিষ্কারের (১৪৯২) মধ্য দিয়েই ইংল্যান্ডে রেনেসাঁর হাওয়া লাগে।

রেনেসাঁ এলিজাবেথান যুগের সাহিত্যকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। তবে উল্লেখ্য যে, সেই সময় লিরিক পোয়েট বা গীতিকবিরাই সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই যুগের চতুর্দশপদী কবিতা ও গীতি কবিতায় রেনেসাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয়।

এলিজাবেথান যুগের বিখ্যাত নাটক 'ডক্টর ফস্টাস' এ রেনেসাঁর প্রভাব অনেকটা লক্ষণীয়। নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো যা ইংরেজী বিয়োগান্তক নাটকের জনক ও ব্লাঙ্কভার্সের অগ্রদূত বলা হয়, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর নাটকে রেনেসাঁর স্পিরিট ব্যবহার করেছেন। আসলে রেনেসাঁর উদ্দেশ্য কি ? অজানাকে জানা এবং অদেখাকে দেখার যে অদম্য ইচ্ছা তাই হলো রেনেসাঁ। প্রাচীনকালে বা রেনেসাঁর পূর্বযুগে মানুষ তার নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার বাইরে অন্য কোন দেশকে জানতে বা চিনতে ভয় পেত। কুসংস্কার নাম ভূত তার কাঁধে ছিল চেপে। ধর্মীয় গোঁড়ামী তার জ্ঞানের পথ ছিল আগলে। কিন্তু এগুলোর বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে আবির্ভাব ঘটল রেনেসাঁর। রেনেসাঁ মানুষকে শেখালো কিভাবে বিদ্রোহ করতে হয় অনেক দিনের লালিত কিছু ঘুণে ধরা বিশ্বাস ও প্রথার বিরুদ্ধে। ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের জ্ঞান লাভের পথ, নিজেকে চেনার পথ বা আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টির পথ ইত্যাদিকে যে অবদমিত করে রাখা যায়না রেনেসাঁ তাই শেখালো মানুষকে।

এই ধারনার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে ডক্টর ফস্টাসের চরিত্রের মধ্যে। ডক্টর ফস্টাস ধর্মতত্ত্বে অর্জন করেছেন শিক্ষা জীবনের সর্বোচ্চ ডিগ্রী। ডক্টরেট । এছাড়া জ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর অবাধ বিচরণ। চিকিৎসা শাস্ত্র তাঁর নখ দর্পণে। দর্শণ শাস্ত্র, সেতো তাঁর কাছে কিছুই না। যেকোন জটিল প্রশ্নের উত্তর সে নিমির্ষে দিয়ে দেয়। কিন্তু সমস্যাটা হলো সে ডক্টর ফস্টাস এবং সর্বোপরি একজন মানুষ। সে তো পারে না মৃত কে জীবন দিতে, অথবা জীবীতকে অমর বানাতে। এখানেই সমস্যা। এখানেই রেনেসাঁর স্পৃহা নিহীত। সে জানে যে, এখানেই মানুষের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সে এই সীমাবদ্ধতাকে সহজেই মেনে নেবে কেন ? সে যে রেনেসাঁর বরপুত্র। তাই সে অসাধ্যকে সাধ্য করতে চায়, সে চায় সীমাকে অতিক্রম করে অসীমকে খুঁজতে।

ডক্টর ফস্টাস, যে কিনা রেনেসাঁর বরপুত্র সে ধর্মের বিরুদ্ধে, খৃষ্টিয়ানিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। ধর্ম কি দিয়েছে তাকে ? ধর্ম তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে ভীতির। সীমা লঙ্ঘনের ভীতি। ধর্ম তাকে বলেছে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কিন্তু কেউ কি পাপের উর্ধ্বে ? আচ্ছা ধরলাম আমি পাপ করছিনা। তাহলে কি আমি অমরা হয়ে যাব। না। তবে কেন এই পাপ ভীতি ? তাইতো ফস্টাস প্রশ্ন করেছে স্বর্গ বা নরক কি ? এটা কি ছেলে ঘুমানি গল্প? এগুলোকি মানুষের দুর্বলতার ফসল ? কাজেই সে শয়তান লুসিফার ও

তার দোসর মেফিস্টোফিলিস এর সাথে করেছে দোস্তী। করেছে চুক্তি। এ যেন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

রেনেসাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ হয়ে পড়েছে একাকী। অসহায় ডক্টর ফস্টাস লুসিফারের সাথে চুক্তি সই করার পর সে সত্যি সত্যিই একাকী হয়ে পড়ে। সে যে একটা প্রেতাত্মা। তাকে আমরা সমাজের সাথে মিশতে দেখিনা।

জওহরলাল নেহেরু তাঁর বিখ্যাত বই 'ডিস্কোভারি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন যে, রেনেসাঁ যতটা না বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল বিজ্ঞানকে, তার চেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল দুঃসাহসিক অভিযানকে। ডক্টর ফস্টাস অদেখাকে দেখা এবং অজানাকে জানার জন্যে অভিযান করেছে ড্রাগন চালিত রথে চেপে বিশাল সুউচ্চ পর্বত রাজির উপর দিয়ে, আবার কখনও বা সাত পাহাড়ের উপর অবস্থিত রোম নগরীর উপর দিয়ে। সে জানতে চায় অজানাকে। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি বিধিও সে অবগত হতে চায়।

রেনেসাঁর বর পুত্রের মতই সে সৌন্দর্য পিপাসু। শিল্প প্রেমিক সে। তাইতো সে ট্রয়ের হেলেনকে আহবান করতে সংকোচ করে না। সে যেন হেলেনের কমনীয় অধরে চুম্বন করে জীবন পাত্রের শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করতে চায়।

যাই হোক, বর্তমান যুগে চলছে রেনেসাঁর ক্লাইমেক্স।সম্মুখে . এগিয়ে যাওয়াই হলো বর্তমান যুগের প্রবণতা। আর রেনেসাঁই বর্তমান যুগকে সম্মুখে সদর্পে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে।

FAREWELL TO ARMS

আত্মজীবনীমূলক নয়, বরং কল্প কাহিনী

১৯৫৪ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস যখন ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হলো তখন থেকেই একদল সাহিত্য সমালোচক একে আত্মজবিনীমূলক উপন্যাস বলে আসছেন। হেমিংওয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, মানব মনের নানা পরিবর্তন ওনিষ্ঠুরতা তিনি অতি কাছ থেকে উপলব্ধি ও অবলোকন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ''ফেয়ার ওয়েল টু আর্মসের'' পটভূমি তাঁর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একে অনেকেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলতে নারাজ। একে কেউ কেউ আবার ফিকশনাল অটোবায়োগ্রাফীও বলেছেন। এবার দেখা যাক 'ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস' আসলে কি ধরনের উপন্যাস।

'Farewell To Arms' উপন্যাসে দুইটি Theme পাশাপাশি প্রবাহমান একটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল এবং অপরটি হেনরির প্রেমকাহিনী। উপন্যাসটিতে যুদ্ধের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা হেমিংওয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই Record. প্রথম Chapter এ সৈন্যদের পিঠে বোঝা চাপিয়ে ৬ মাসের গর্ভবতীর মতো চলার যে ভঙ্গির কথা Hemingway বর্ণনা করেছেন, তা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা বর্ণনা বলেই প্রতিভাত হয়। তথাপি উপন্যাসটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস অথবা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস নয়। এর প্রমাণও পাওয়া যায়। তবে এর Historical Significance আছে। উপন্যাসের প্লট তৈরীতে Hemingway ব্যবহার করেছেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যা তিনি অর্জন করেছিলেন ১৯১৭ সালে ইটালিযান ফ্রন্টে যুদ্ধের সময়। তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন ব্রিটিশ মিত্র বাহিনীর সদস্য রূপে। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও রাশিয়া Austro-Hungarian force এর বিরুদ্ধে যে বাহিনী নিযুক্ত করেছিল, তার সদস্য হিসেবে হেমিংওয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কেপোরেটো তে ইটালিয়ান বাহিনীর যে বিপর্যয় ঘটে তা অবশ্য এই নভেলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কথা হলো বাস্তবিক পক্ষে, হেমিংওয়ে ছিলেন রেড ক্রসের এম্বুলেন্স ড্রাইভার। কিন্তু উপন্যাসের হিরো ফ্রেডেরিক হেরনী হলেন একজন লেফটেন্যান্ট । ৩০তম Chapter এ হেনরী

একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছে - কিভাবে সে অল্পের জন্যে বন্দুকের গুলি হতে বেঁচে নদীতে ঝাপ দিয়ে যুদ্ধকে ফেয়ার ওয়েল জানালো। হেমিংওয়ের জীবনে এরূপ ঘটেনি। যুদ্ধ চলাকালে। হেমিংওয়ে যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। হেনরিও হয়েছিল। তবে হেমিংওয়ে যুদ্ধরত অবস্থায় আহত হন নি। তিনি যখন সিগারেট বিতরণ করছিলেন সৈন্যদের মধ্যে তখন তিনি আহত হন। কিন্তু ফ্রেডেরিক রিনাল্ডিকে বলেছে যে, যখন সে চিজ বা পনীর খাচ্ছিল তখন সে আহত হয়। হেমিংওয়ে যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন কি না তা জানা যায় না, তবে ফ্রেডেরিক Front লাইনে যুদ্ধ করেছে।

উপন্যাসের একটা জায়গায় বেশ বড় ধরনের বৈপরীত্য চোখে পড়ে। এটা হলো যখন হেনরী যুদ্ধে আহত হয়, তখন তাকে মিলানের American Hospital এ ভর্তি করা হয়। কিন্তু ইতিহাস বেত্তাগণ বলেন যে, ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত অ্যামেরিকা যুদ্ধে যোগ দেয় নি। আমেরিকার কোন Advanced troops ও ছিল না ইটালিতে। এবং ১৯১৭ সালের মে মাসেও আমেরিকার কোন হসপিটাল ছিল না সেখানে। এখানে স্বচ্ছভাবে ধরা পড়ে যে, হেমিংওয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এখানে।

মিলানের হাসপাতালে হেমিংওয়ের নার্স ছিল এগনেস ভন। অনেকে এই এগনেস ভনের সাথে ক্যাথিরিন বার্কলের সাদৃশ্য খুঁজেছেন। আসলে এই সাদৃশ্য খোঁজাটা খুব একটা যুক্তি সঙ্গত নয়। ফ্রেডেরিক একজন শয্যাশায়ী রোগী। এমতাবস্থায় হাসপাতাল কক্ষে একটা নার্সের সাথে রাত কাটানো (!) কতটুকু সম্ভব। হেমিংওয়ের বন্ধু Henry Villard সাক্ষাত করেছিলেন এগনেস ভনের সাথে হেমিংওয়ের মৃত্যুর পর। ভন ক্যাথিরিনের চরিত্রটা পড়ে ও শুনে তো মরহুম হেমিংওয়ের উপর রেগে মেগে তুলকালাম কান্ড বাঁধিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, হেমিংওয়ে যদি তাকে ক্যাথিরিনের মধ্যে প্রতিফলিত করতে চেয়ে থাকেন, তবে তিনি ভূল করেছেন, কারণ ক্যাথিরিনে মত তিনি নন। এছাড়া একটা মারাত্মক আহত শয্যাশায়ী রোগীর রোগ শয্যায় ফুলশয্যা রচনা করার মত রুচি তার নেই।

সর্বোপরি এই উপন্যাসের ৪১তম Chapter এ ক্যাথিরিন যখন অন্তিম শয্যায় শায়ীত হেনরীর মধ্যে আমরা যে টেনশন দেখি তা যেন বিশ্বের সকল সহানুভূতিশীল প্রেমিকের আকূল করা আবেগের উচ্ছাস। ক্যাথিরিনের সন্তান

ভূমিষ্ট হয়েছে অনেক দেরীতে - সিজারিয়ান পদ্ধতিতে। ক্ষতটা বিরাট। উপরোন্ত বার বার তার হেমোরেজ হচ্ছে। এমতাবস্থায় হেনরী বুঝতে পারে যে সে তার অন্তরের প্রিয় পাত্রীকে আর ধরে রাখতে পারবে না।তবুও মন মানে না। সে God এর কাছে আকূল বাবেদন জানায় -

"Please, Please, Please, dear God,
dont let her die."

এ আবেদন যে Universal আবেদন। সর্বকালের সকল মানুষের আবেদন তাঁর প্রিয়জনকে ধরে রাখার ''যেতে নাহি দেব।'' এখানে হেমিংওয়ের Farewell to Arms আত্মজীবনীর সংকীর্ণ গন্ডী পেরিয়ে সার্বজনীন আবেগের প্রচারনায় লিপ্ত হয়েছে।

তবে হ্যাঁ - হেনরীর জীবনে আমরা কি দেখি। সে শেষ পর্যন্ত কি পায়? সে আঁকড়ে ধরে ক্যাথিরিনকে নতুন করে বাঁচার জন্যে। বিভীষিকাময় যুদ্ধকে সে ফেয়ার ওয়েল জানায় ক্যাথিরিনের হাত ধরে নতুন করে বাঁচার জন্যে। বিনিময়ে সে পায় Nothingness. ক্যাথিরিনের মৃতদেহ পড়ে আছে হাসপাতালের অন্ধকার কক্ষে। আর হেনরী অন্ধকার রাতে ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে রওনা দেয় হোটেলের দিকে। যেখানে তাকে ওয়েলকাম জানানোর কেউ নেই। হেনরীর জীবনের Nothingness যেন হেমিংওয়ের জীবনেরই Nothingness. যদি তার জীবন তার কাছে Meaningless নাই মনে হবে তবে কেন এই নবেল বিজয়ী বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আত্মহত্যা করবেন?

প্রথম মডার্ণ হিরো হ্যামলেট

আধুনিক কাল অত্যন্ত জটিল ও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দ্বারা সমৃদ্ধ। নব নব Theory এর অবতারনা, Materialism এর অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধন, ধর্মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর অকাট্য প্রতিযোগীতা এবং সর্বোপরি পর পর দু'ইটি বিশ্বযুদ্ধ ও সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয় আধুনিক কালের মানুষকে একে বারে বদলে দিয়েছে। আধুনিক কালে মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনেছে ডার উইনের The Origin Of Species. মানুষ নিজেকে যতটা Conscious মনে করে, ততটা Conscious যে সে নয়, তা উন্মোচন করেছেন ফ্রয়েড। মানুষের শরীর যে একটা Biological System ছাড়া আর কিছু নয় তা মানুষ জেনেছে ফ্রয়েড থেকে। প্রকৃতির Mystry গুলো Reveal হচ্ছে আর ফলশ্রুতিতে মানুষ কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসছে। মানুষ ভুগছে মানবত্বহীনতায়। সার্ত্রে, কিয়ার্কে গার্ড, নিটশে প্রমুখ বিখ্যাত দার্শনিকদের জীবন দর্শন পালটে দিয়েছে ও দিচ্ছে মানুষের Conventional চিন্তা-চেতনাকে। দ্বিতীয় রেনেসাঁ মানুষকে দিচ্ছে অভূতপূর্ব বেগ আর ছিনিয়ে নিচ্ছে হৃদয়ের গভীরের সব কোমল অনুভূতি গুলো। যন্ত্রের যুগে মানুষ হয়ে পড়ছে যান্ত্রিক ও আবেগহীন। অর্থনৈতিক সমস্যা, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক মূল্যবোধ হানি, প্রগতিশীল চিন্তাধারা ইত্যাদি মডার্ণ বা আধুনিক কালের মানুষকে বড়ই ভীতু, কাপুরুষ ও একা করে দিয়েছে। মানুষ আজ আশা করতে ভয় পায় যে সুদিন আবার আসবে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে পুঁজিবাদী সমাজের মানুষেরা। সামন্ত যুগের মানুষদের মত এরা হিরো বা হিরোইজের সাক্ষাৎ পায় না, এটি এন্টিহিরোর দলে ভিড়ছে। এমন কোন মহান কারণ নাই যে জন্য মানুষ প্রাণ দিয়ে সার্থক করে তুলতে পারে তার জন্মকে।

এমনই মডার্ণ লোকদের একজন প্রতিনিধি শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট। আসলেই একজন মহান শিল্পী একজন মহান দার্শনিকও বটে। আজ থেকে চারশ বছর পূর্বে শেক্সপীয়ার সে কথাই প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর চারশ বছর পূর্বে সৃষ্ট হ্যামলেট আজ সবার মধ্যে বিরাজমান।

হ্যামলেটের চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো সিদ্ধান্ত হীনতা। কিং হ্যামলেট মারা গেছেন। কিন্তু প্রিন্স হ্যামলেটের মতে তাঁর বাবা খুন হয়েছেন। সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে এবং তাঁর বাবার প্রেতাত্মার সাথে কথোপকথন তার সন্দেহকে আরও দেয় বাড়িয়ে। ক্লডিয়াস, হ্যামলেটের চাচা হলো খুনী।

কিন্তু হ্যামলেট পারে না তার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে। যদিও সে বেশ শক্ত প্রতিজ্ঞাই করে তার বাবার হত্যাকারীর আত্মাকে পাঠিয়ে দেবে সে নরকে। কিন্তু তা হয়ে ওঠে না। সিদ্ধান্তহীনতা পেয়ে বসে তাকে। এমনকি Mouse trap (নাটক) stage করে সে নিশ্চিত হয় তার বাবার হত্যাকারীর আসল পরিচয় সম্বন্ধে, কিন্তু তার পরও দীর্ঘসূত্রিতা পেয়ে বসে। সে পাগলের (disposition) ভান করে। শেষ পর্যন্ত হ্যামলেট যখন সার্থক হয় প্রতিশোধ নিতে তখন যেন তা আর Revenge বা প্রতিশোধ নয়, তা আত্মরক্ষায় রূপ নেয়। হ্যামলেটের মাকে প্রাণ দিতে হয়, ক্লডিয়াসের কুটিলতার জালে। হ্যামলেটেরও প্রাণ বায়ু বের হয়ে যায় যায় অবস্থা লিয়াটিসের বিষাক্ত তলোয়ারের আঘাতে। হ্যামলেটের যেন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। ঠিক তখনই সে তার মিশন সম্পন্ন করে ক্লডিয়াসকে খুন করে। হ্যামলেটের ট্রাজেডির জন্য তার সিদ্ধান্তহীনতাই মূলত দায়ী। সে ছিল রাজ্যের সব প্রজার প্রিয় পাত্র। রাজা হবার মত তার স্থিতধী বয়স ও যোগ্যতা সবই ছিল। জনগণকে সাথে নিয়ে সে বিপ্লব ঘটিয়ে ক্লডিয়াসকে হঠাতে পারত গদি থেকে। হয়তবা জীবন থেকেও। কিন্তু না। হ্যামলেটের সিদ্ধান্তহীনতাই তাকে বাধা দিয়েছে তার লক্ষ্যে সময় মত পৌছতে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে আত্মরক্ষার্থে হ্যামলেট পাগলের ভান করেছে। কথাটি কিছুটা ঠিক। পুরোপুরি যে নয় তা আগেই বলা হয়েছে আধুনিক কালে এত বেশী সমস্যা যে এগুলোর ভীড়ে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই এলিয়টের আধা বয়সী, টেকো মাথার প্রুফ্রকের মত মডার্ণ মানুষরা সর্বদাই সংশয়ে সংকল্প বিসর্জন দেয়। মডার্ণ মানুষরা সবাই প্রুফ্রক আর এই প্রুফ্রকই হলো হ্যামলেটের মডার্ণ সংস্করন।

হ্যামলেট কিন্তু Sexual game এর ব্যাপারে উদাসীন। তাঁর ঔদাসীন্য অফেলিয়ার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে বললে ভুল হবে না। "Fraity thy name is women" এই উক্তিটি যদিও হ্যামলেট তার মাকে উদ্দেশ্য করেই করে, তথাপি এই উক্তিটি হ্যামলেটের সমগ্র নারী জাতির frailty এর ঈঙ্গিতই বহন করে। হ্যামলেট অফেলিয়াকে রাগান্বিত স্বরে ধমক দিয়ে বলে, সে যেন কারো অংকশায়িনী না হয়। সে যেন চলে যায় সন্ন্যাসী আলয়ে। যাই হোক এসব কথা হ্যামলেটের Sex এর প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে। মডার্ণ মানুষরা Sexual game বা ব্যাপার স্যাপারকে একটা জৈবিক প্রক্রিয়া ছাড়া বেশী কিছু ভাবে না। ফ্রয়েডও তাই বলেন। মডার্ণ কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকরাও এই ধারনাই ব্যক্ত করেছেন। যাই হোক, হ্যামলেটের অফেলিয়ার প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তা মডার্ণ মানুষদের Sex এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক।

হ্যামলেট কিন্তু একা। সবার মধ্যে থেকেও যেন সে কারও মাঝে নেই। পিতার মৃত্যুর পর সে যখন ডেনমার্কে আসে, তখন কিন্তু তার মা পেরুট্রড তার দুষ্টমতি চাচা ক্লডিয়াসের অংকশায়িনী। মানসিকভাবে হ্যামলেট তার মাকে হারাল বাবাকে হারানোর প্রায় সাথে সাথেই। তার বন্ধু রোজনক্রাঞ্জ ও গিলডেনস্টার্ন, যাদেরকে সে বিশ্বাস করত ; ভালবাসত অন্তর থেকে তারাও হ্যামলেটের বিশ্বাস ভঙ্গ করল ক্লডিয়াসের গুপ্তচর বৃত্তির চাকরি নিয়ে। হ্যামলেট মানসিক ও বাহ্যিক - দুই জগতেরই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি যার সাথে তাল মিলাতে পারে না অফেলিয়ার মত শুধু বাহ্যিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেয়ে। প্রত্যেকের চোখে-মুখে সন্দেহ হ্যামলেটের প্রতি। হ্যামলেটের প্রতি কেউ উদার মনোভাব পোষণ করে না। সবার কাছ থেকে অসহযোগিতা, সন্দেহ আর প্রতিহিংসা পরায়ণতায় সে পায়। সবার মধ্যে থেকেও সে একা।

মডার্ণ যুগ হলো সমস্যার যুগ। এখানে এত বেশী সমস্যা যে মানুষ তার অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমানে অসহায় হয়ে পড়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সর্বপরি নৈতিক সমস্যার ধুম্র জালে পড়ে মডার্ণ মানুষ খেই হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ পারছে না রক্ষা করতে তার মনের ভারসাম্য। প্রত্যেকে যেন হয়ে পড়ছে এক একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। প্রত্যেকে হয়ে পড়ছে ক্ষ্যাপা আর অস্থির। হ্যামলেটের অবস্থাও হয়েছিল ঠিক এমন। রাজনৈতিক ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা হ্যামলেটকে Antic disposition ধারণ করতে বাধ্য করেছিল।

এজ ইউ লাইক ইট এ প্যারালেলিজম ও কনট্রাস্ট

শেক্সপীয়ারের "এজ ইউ লাইক ইট " সাদৃশ্য ও বৈপরীত্যে যতটা সমৃদ্ধ তাঁর আর কোন নাটক ততটা সমৃদ্ধ নয়। চরিত্র ও ঘটনা-শ্রেণী- উভয় ক্ষেত্রে শেক্সপীয়ার এই কৌশলটি প্রয়োগ করতে সিদ্ধ হস্ত। শেক্সপীয়ারের, বিশেষ করে কমেডি গুলোর প্লট বেশ কিছু ঘটনার দ্বারা সুক্ষভাবে বুনানো। এই ঘটনা গুলোর কিছু কিছুর মধ্যে সাদৃশ্য আবার কিছু কিছুর মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। আবার কখনও কখনও নাটকের কিছু কিছু চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য আবার কিছু কিছু চরিত্রের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ব্যাপারকেই সাহিত্যে Parallelism এবং Contrast নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। তবে আলোচনার প্রেক্ষিতে একটা কথা না বললেই নয় এবং তা হলো Story ও Plot এর মধ্যে পার্থক্য। Story হলো কালের সাথে সঙ্গতি রেখে কতিপয় ঘটনার বর্ণনা ; আর Plot হলো কারণ ও ফলাফলের সম্পর্কের ফসল। যেমন: রাজা মৃত্যু বরণ করলেন। কিছুদিন পর রাণীও মৃত্যু বরণ করলেন। এই ঘটনা গুলোর বর্ণনাই হলো Story. আর যদি এমন হয় যে, রাজা মারা গেলেন এবং সেই শোকে রাণীও মারা গেলেন, তবে একে আমরা Plot বলব। কারণ এক্ষেত্রে Cause এবং Effect এর ব্যাপার আছে। এবার আসল কথায় আসা যাক।

একদিকে Aristocratic পরিবারের দুই Duke ভাই এবং অপর দিকে সাধারণ পরিবার De Boys Famely এর দুই ভাই এর কাহিনী এজ ইউ লাইক ইট নাটকের প্রধান কাঠামো তৈরী করে। এই দুই পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনী সমান্তরাল ভাবে সমগ্র নাটকে প্রবাহিত হয়েছে। Duke Senior আর Duke Fredrerik যেমন একে অপরের বিপরীত বা Contrasted, তেমনি অলিভার আর অরল্যান্ডোও এক অপরেরর বিপরীত চরিত্র। একদিকে ডিউক সেনিওর যেমন সবার কাছে প্রিয়, মহৎ, হৃদয়মান, অমায়ীক ও উদার ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে ডিউক ফ্রেড্রেরিক সবার চোখে উদ্ধত, দাম্ভিক ও অত্যাচারী শাসক হিসেবে বিবেচিত। ডিউক সেনিওর দার্শনিক মনের অধিকারী আর তাইতো তিনি ফরেস্ট অব আর্ডেনের প্রকৃতিতে জীবনের অর্থ খুঁজে পান। অপর দিকে ডিউক ফ্রেড্রেরিকের চিন্তা বৈষয়ীক, সংকীর্ণ ও স্বার্থপরতা দুষ্ট জীবন ভাবনায়। সম্ভবত: 'Tempest' এর Prospero এর মতো তিনিও জাগতিক স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে জীবনের গভীর অর্থ খুঁজতে বইয়ের পাতায় হারিয়ে ফেলেছিলেন

নিজেকে। আর সেই ফাঁকে পার্থিব সার্থন্বেষী Duke Fredrerik সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন তার বড় ভাই ডিউক সেনিওরকে জোর পুর্বক Forest of Arden এ নির্বাসিত হতে। ডিউক সেনিওর যে কুসুম কোমল চরিত্রের অধীকারী তার পরিচয় ফরেস্ট অব আর্ডেনেই আমরা পাই। সামান্য কিছু সংখ্যক গুণগ্রাহী সভাসদের সাথে প্রকৃতির কোলে বাস করেই তিনি সুখী। প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই তিনি খুঁজে পান সৌন্দর্য কারণ মনটা তাঁর সুন্দর।

[" And this our life exempt from Publik haunt,
Finds tongues in trees, books in the running brooks,]
Sermons in stones and good in every thing ;
I would not change it."

তাহলে আমরা দেখছি যে, Duke পরিবারে বড় ভাই হচ্ছে ছোট ভাইয়ের দ্বারা নির্যাতিত ও নির্বাসিত।

এবার আসা যাক অলিভার ও অরল্যান্ডোর পরিবারে। এদের বাবা স্যার রোনাল্ড ডি বয়েজ বেশ আগেই মারা গেছেন। তিনি ছিলেন সৎ মানুষ, নির্বাসিত ডিউক সেনিওরের প্রিয় পাত্র। অলিভারেরা তিন ভাই। মেজো ভাই জ্যাক্স শহরে থেকে পড়াশুনা করছে। বড় ভাই অলিভার বঞ্চিত করেছে ছোট ভাই অরল্যান্ডোকে স্বাভাবিক শিক্ষা-দিক্ষা, আচার ব্যবহার শেখা থেকে। শুধু তাই নয়, সে বঞ্চিত করেছে অরল্যান্ডোকে বাবার সমপত্তি থেকেও। Duke Fredrerik এর পেশাদারী কুস্তিগীর চার্লসকে সে প্ররোচিতও করেও অরল্যান্ডোকে হত্যা করতে। এতে ব্যর্থ হয়ে অরল্যান্ডোর শোবার ঘরে রাতে আগুন লেগে দেয়ার ঘৃণ্য পরিকল্পনাও সে করে। যদিও অ্যাডামের সহায়তায় অরল্যান্ডো রক্ষা পায় আর প্রাণ রক্ষার্থে সেই ফরেস্ট অব আর্ডেনেই আত্ম নির্বাসিত হয়। এভাবে আমরা উভয় পরিবারে ভাই কর্তৃক ভাইয়ের অত্যাচারিত হওয়ার সমান্তরাল দৃশ্য দেখছি। এক্ষেত্রে একটু বৈসাদৃশ্য পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তা হলো ডিউক পরিবারে ছোট ভাই কর্তৃক বড় ভাইয়ের উপর নির্যাতন আর ডি বয়েজ পরিবারে বড় ভাই কর্তৃক ছোট ভাইয়ের উপর নির্যাতন।

দুই পরিবারের অত্যাচারী দুই ভাইয়ের আত্ম সংশোধনীর মধ্যেও সাদৃশ্য বিদ্যমান। নাটকের শেষের দিকে এরা উভয়ই নিজেদের অন্যায় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয় ও Convert হয়ে যায় ভাল মানুষে। তবে এদের Convert

হওয়ার উপায়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। Duke Fredrerik যখন তার বড় ভাই Duke senior কে হত্যা করার জন্য বিশাল সৈন্য সামন্ত নিয়ে Forest of Arden এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন একজন বৃদ্ধ ধার্মিক লোকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁর বদ খেয়াল ত্যাগ করেন। তাঁর ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চান। রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করে বনেই থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অপর পক্ষে অলিভার Forest of Arden এ ক্ষুধার্ত সিংহীর হিংস্র থাবা থেকে বেঁচে যায় অরল্যান্ডোর কারণেই। এ ঘটনায় মুগ্ধ হয়ে নিজের ভুল সে বুঝতে পারে এবং অনুশোচনার আগুনে পুড়ে খাঁটি মানুষে পরিণত হয়। অরল্যান্ডোর কাছে ক্ষমা চায়। ডিউক ফেড্রেরিক এর মেয়ে সিলিয়াকে বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালনে ব্যাপ্রিত হবে বলে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ডিউক ফ্রেডেরিকের মত সন্ন্যাসী হতে চায়না সে।

ফিবি আর অড্রের চরিত্রের মধ্যেও আমরা পাই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। এরা দু'জনেই গ্রাম্য মেষ চারিনী। কিন্তু দু'জন যেন একেবারেই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। ফিবি লিখতে পড়তে জানে। সে সুন্দরী। অনেকের হৃদয়েই সে প্রেমের ঝড় তুলেছে ; ভেঙ্গেছে অনেকেরই অন্তর। এদের একজন হলো সিলভিয়াস, গ্রাম্য মেষ চারক। সিলভিয়াস ভালবাসে ফিবিকে অন্তর থেকে, কিন্তু ফিবি তো মন দিয়েই ফেলেছে গানিমিডকে। প্রেমটা অবশ্য এক তরফা। ফিবি জানে না গানিমিড আসলে রোজালিন্ড। অবশেষে রোজালিন্ড স্বীয় রূপে আবির্ভূত হলে (ছদ্মবেশ বর্জন করে) পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞানুযায়ী সে সিলভিয়াসকেই বিয়ে করার জন্য রাজি হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অড্রে কুৎসিত। লেখা-পড়ার সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। তাকে সিলভিয়াসের মত কেউ অন্তর দিয়ে ভালবাসে না। সে নিজেও কারো হৃদয়ে প্রেমের ঝড় তুলতে পারে না। টাচস্টনের মত ভাঁড় তাকে ভালবাসে। একে অবশ্য প্রেমহীন ভালবাসা বলা যায়। সে অড্রেকে বিয়ে করবে অলিভার মারটেক্স এর দ্বারা কারণ অলিভার গেঁয়ো যাজক যে বিয়ে করিয়ে দেয় বিনা রেজিষ্ট্রেশনে। এতে মাস দু'য়েক পরে টাচস্টন আইনের ঝামেলা এড়িয়ে সহজেই গ্রাম্য, অসুন্দর ও সহজ সরল অড্রেকে ত্যাগ করতে পারবে। অর্থ্যাৎ টাচস্টন শুধু তার কাম তাড়না মেটানোর নিমিত্তেই বিয়ে করবে অড্রেকে।

অলিভার ও সিলিয়ার মধ্যকার প্রেম অরল্যান্ডো ও রোচালিন্ডের প্রেমের বিপরীত (Contrasted). অরল্যান্ডো ভালবাসে রোজালিন্ডকে তার অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে। অরল্যান্ডো রোজালিন্ডকে দেখেছে শুধু একবার। Wrestling

Scene এ। ফরেস্ট অব আর্ডেনে সে চেনে নি তার প্রেমিকাকে। তবুও তাকে বলতে শুনি -

I Shall love my Rosalind for ever and a day.

রোজালিন্ড গানিমিডের ছদ্মবেশে উপভোগ করে অরল্যান্ডোর প্রেম কথন। সে ইচ্ছা করলে নিবির কুঞ্জে ছদ্মবেশ বর্জন করে অরল্যান্ডোর বাহু পাশে আবদ্ধ হতে পারত। কিন্তু তা করে নি। করার প্রয়োজন হয় নি। কারণ তার ভালবাসার আবাস স্থল তো হৃদয়, নশ্বর শরীর বা দেহ নয়। অপর পক্ষে, অলিভার ও সিলিয়া একদিনও অতিবাহিত করতে অপারগ বিয়ে না করে। রোজালিন্ড আর অরল্যান্ডোর প্রেম যেখানে হৃদয়ে বিরাজমান সিলিয়া আর অলিভারের প্রেম সেখানে রক্ত মাংসে বন্দী।

আসলে Parallelism এবং Contrast হলো কমেডির Basis বা ভিত্তি। স্রোতের বিপরীতে বাতাস বইলে যেমন নদীতে ঢেউ ওঠে, তেমনি Parallelism ও Contrast এর সাহায্যে নাট্যকার প্রধান চরিত্রগুলোকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও অধিকতর শক্তিশালী করে তোলেন। এছাড়া নাট্যকার তাঁর নাটকের বিষয় বস্তুর সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে বা ব্যাপকতা বৃদ্ধিতে এই কৌশলটি ব্যবহার করে থাকেন। শেকস্‌পীয়ারের মত জাত শিল্পী বেশ ভালভাবেই জানেন কিভাবে মানব জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র অংকণ করতে হয়।